ঘরে ফেরা

মহাশ্বেতা দেবী

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৬৫

মুদ্রাকর
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

ঋত্বিককে—

এক

তখনো কালাটোপে ছিল দেবাদিদেব, ঈপ্সিতার টেলিগ্রাম যখন ডালহৌসীতে আসে, সেই জন্যেই সঙ্গে সঙ্গে পায়নি। ঈপ্সিতাকে ডালহৌসীর টুরিস্ট আপিসের ঠিকানা দেওয়া ছিল। দেবাদিদেব বলেছিল, দিন চারেক ডালহৌসীতে থাকব, তারপর কাশ্মীর যাব। কাশ্মীর ঘুরে ফিরতে ফিরতে ধরো আরো কয়েক দিন যাবে।

ডালহৌসীর পর দেবাদিদেব কাশ্মীরেই যেত। কিন্তু টেলিগ্রামটা সব প্রোগ্রাম পালটে দিয়ে চলে গেল ঝড় তুলে।

কালাটোপ যাবার কোন কথাই ছিল না। ডালহৌসীতে থাকবে বলেই এসেছিল দেবাদিদেব। পাঠানকোটে হিমাচল প্রদেশের টুরিস্ট আপিসে কোন ভিড় ছিল না। সবাই তো কাশ্মীরেই যায়, কাশ্মীর টুরিস্ট আপিসেই যত ভিড়। হিমাচলের টুরিস্ট অফিসার ছেলেটি খুবই ভালো, সজ্জন। ডালহৌসী বিষয়ে উচ্ছ্বসিত।

ডালহৌসী তো বাঙালীদের কাছে তীর্থ।

কেন?

রবীন্দ্রনাথ ওখানে ছিলেন।

তা বটে।

ডালহৌসী খুব নির্জন জায়গা।

নির্জন জায়গাই খুঁজছি।

আপনি কি···

লেখক।

নাম?

দেবাদিদেব-বসু।

দেবাদিদেব দেখে আঘাত পেয়েছিল, লোকটি সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন নামটি চেনে না ?

কি লেখেন ?

গল্প, উপন্যাস।

ও।

ডালহৌসীর বাস কখন পাব ?

আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

ডালহৌসী খুব ভিড়ের জায়গা নয় তো ?

না, না। আমি তো বলি, সবচেয়ে সুন্দর পাহাড়ী স্টেশন ডালহৌসী। বরফ-ঢাকা পাহাড় দেখতে মানুষজন কৌশানী যায়, ডালহৌসী হল ধৌলাধর রেঞ্জের খুব কাছে। চারদিকে ববফ-ঢাকা পাহাড়। বড় বড় ওক গাছ দেখতে পাবেন। টেগোরের সে-বাড়ি ডালহৌসীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায়।

বাসে ডালহৌসী-যাত্রী টুরিস্ট কমই ছিল। কয়েকটি পাঞ্জাবী ছেলে। ওরা ডালহৌসীতে চাষবাস করছে। পাঠানকোট থেকে চাষের কি কি সরঞ্জাম কিনে নিয়ে ফিরছে। একজন বলল, আমার ফার্ম দেখে যাবেন একদিন। একেবারে মডার্ণ ফার্ম।

ডালহৌসীতেই থেকে যাবে ভেবেছিল দেবাদিদেব, কিন্তু ডালহৌসীতে পৌঁছেই বুঝেছিল, ডালহৌসী বুড়িয়ে যাওয়া, মৃত্যুমুখী পার্বত্য-নগরী। বসবাসের জায়গা। টুরিস্ট আসবার জায়গা নয়। কোন উজ্জ্বলতা নেই, উচ্ছলতা নেই। ছড়ানো জায়গা। হাঁটার মতো পথ একটি মাত্র। বড়ই লোকজনের অভাব। বারবার চোখে পড়ে ক্রীশ্চানদের কবরখানা, গির্জা, সায়েবদের পরিত্যক্ত বাংলো। ওক গাছের পাতা থেকে হিম ঝরছে সবসময়ে। টুরিস্ট লজেও মশার কামড়।

কা দেখিয়ে গা।

টুরিস্ট লজের চৌকিদারও ডালহৌসীর ওপর বীতশ্রদ্ধ, কা দেখিয়ে গা। স্রো টাগোর কা বাংলো, ঔর এক রাজমহল।

দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত বাংলোটিতে উঠতে উঠতে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল বুকে। বাংলোর বারান্দায় বসে রবীন্দ্রনাথকে মনে আনতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের সূর্য ওঠার আগে বরফজলে স্নান এবং দুগ্ধপান খুবই ভালো, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তাঁর ঘোরাঘুরিও ভালো, কিন্তু জমিদারীর আয় ছিল বলেই উক্ত কার্যাদি সম্ভব হয়েছিল। ঈশ্বর যদি সর্বত্রগামী হন, তাহলে তাঁকে সমতলে বসেও লাভ করা চলে। ঝাঁপান চড়ে পাহাড়ের চূড়োয় না উঠলেও চলত। এই টঙের ওপর বসে আরাধনা খুবই ভালো কাজ, যদি দশ-বিশজন পাহাড়ী চাকর পাহাড়ের উৎরাই-চড়াই নিরন্তর ভেঙে সুখসাচ্ছন্দের সামগ্রী জোগায়।

এ কথা মনে হতেই দেবাদিদেবের মনে হয়, কথাগুলি ভাবা ঠিক হচ্ছে না এবং সে রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে চেষ্টা করে। ফলে তার মনের পর্দায় সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে রবীন্দ্র ভূমিকায় এক বালকের চেহারাই জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বিরক্ত হয়ে সে নেমে আসে।

এত পাহাড়, এত বরফ, এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সে অস্বস্তি বোধ করে এবং টুরিস্ট লজে ফিরে মদ খেয়ে তবে স্বস্তি পায়। একটু হাসি, একটু হুল্লোড়, একটু রেডিওর গানের জন্য ওর মন ব্যাকুল হয় নিশুত রাতে, এবং তখন হঠাৎ ওকে আঁতকে দিয়ে কে যেন নারীকণ্ঠে হাহাকারে কেঁদে ওঠে। জানা যায়, সে চৌকিদারের শাশুড়ি। চৌকিদারের শালী মারা গেছে অসুখে, মেয়ের মৃত্যুসংবাদ জেনে সে কাঁদছে। দেবাদিদেব বোঝে, তার মনে তিলমাত্র সমবেদনা আসছে না, কান্নাকাটিকে মনে হচ্ছে অসভ্য উপদ্রব। সকালে সে দেখে. চৌকিদারের শাশুড়িকে সমবেদনা জানাতে আরো আরো মেয়েরা আসছে, সকলেই কাঁদবে বলে প্রস্তুত। এখন ডালহৌসী তার কাছে অসহ্য লাগে। সকালেই সে কালাটোপের বনবাংলোর বুকিং করে নেয়।

হেঁটে যেতে হবে।

বাস নেই ?

না।

অন্য কোন যানবাহন ?

না।

রাস্তা কি রকম ?

ভালোই। কয়েক বছর আগে কালাটোপে অল্ ইন্ডিয়া স্পীকার্স কনফারেন্স হবার কথা হয়। সে জন্যে কালাটোপ অবধি রাস্তা তৈরি হয়।

হেঁটেই যাব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চমৎকার পথ।

হাঁটতে আমি ভালোবাসি।

হাঁটতে গিয়ে দেবাদিদেব বোঝে, হাঁটতে ও ভালোবাসত কোন এক বিস্মৃত অতীতে। দীর্ঘকাল হয়ে গেল, হাঁটা ওর একেবারে অভ্যাস নেই। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, একেবারেই হাঁটে না ও আজকাল। যখন পয়সা ছিল না, তখনই হাঁটত। এখন বহুদিন হয়ে গেল ও একেবারে হাঁটে না। রিক্শা-ট্যাক্সি-মিনিবাস—চড়তে পারে না ট্রাম-বাসে, ভিড়ে কষ্ট হয়। ওর স্ত্রী ঈপ্সিতা এখনো হাঁটে। হেঁটে বাজার-দোকান যায়, ছেলেদের সঙ্গে এখানে-ওখানে। হাঁটতে হাঁটতে এ কথাও মনে হল দেবাদিদেবের, ছেলেদের সঙ্গে ও কখনো কোথাও যায়নি। চিড়িয়াখানা-সিনেমা-খেলার মাঠ-লেক—অথচ দেবাদিদেবের ইচ্ছে ছিল, ছেলেদের সাহচর্য দেবার। ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা। দেবাদিদেব সময় পায়নি। 'সময় করে নিতে হয়'—ঈপ্সিতার ক্লান্ত ও অনিচ্ছুক গলা। ঈপ্সিতা বুঝবে না। দেবাদিদেব বস্তুকে চিরকাল বাইরে বাইরে নিজেকে খরচ করতে হয়েছে।

হেঁটে চলতে চলতে এই প্রথম দেখল বরফ। পাথরের গা দিয়ে বরফ নামছে, নামছে। ধূলোর আস্তর সরাতে ধপধপে সাদা। খেয়ে

দেখতে লোভ হচ্ছিল, খেল না। নিজেকে সে বাইরের সংক্রমণ থেকে সযত্নে বাঁচায়, নিরন্তর। বরফ খেয়ে গলা বসে যেতে পারে। তবু কি আশ্চর্য, বরফ। দেবাদিদেব বরফের ওপর নাম লিখবে না কি? বরফে নাম লিখবার কথা মনে হতেই মনে পড়ল, সমুদ্রের তীরে বালিতে ও নাম লিখছে, রেশমা তুরানী দেখছে। আফঘান মেয়ে। গণনাট্যসংঘের কর্মী, নাচত। রেশমা দেবাদিদেবকে বলত, নার্সিসাস।

দেবাদিদেব লিখল, আঙুল দিয়ে, দেবাদিদেব। তাবপব একটা পাথবে বসল, সিগাবেট ধরাল। ডালহৌসী ফিরে যাবে না কি? ফিবে গেলেই হয়। হাঁটতে হাঁটতে কালাটোপ! আচ্ছা, ও যদি চোখ বোজে, আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় যদি? ড্রাইভাব বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

যেহেতু দেবাদিদেব ঈশ্বরপ্রতিম, সেহেতু একটি জীপ এসে দাঁড়াল। সেনাবিভাগের জীপ। ড্রাইভার তরুণ অফিসার। এখন দেবাদিদেবের মনে পড়ল, কালাটোপের কাছেই আছে আর্মি সেণ্টার।

ড্রাইভার মুখ বাড়াল। কোথায় যাচ্ছেন?

কালাটোপ।

আসুন।

আপনি?

ওখানেই।

কোন অসুবিধে হবে না তো?

না, আসুন।

দেবাদিদেব উঠে বসেছিল জীপে। ছেলেটি ওকে কালাটোপ পৌঁছে দেয়।

পথে কিন্তু ছেলেটি একটা গল্পও করেনি। এতটুকু অন্তরঙ্গ হয়নি। প্রথমেই জিগ্যেস করেছিল, কি করেন?

লিখি।

কি লেখেন ?

গল্প, উপন্যাস।

নাম ?

দেবাদিদেব বসু।

দেব বসু !

হ্যাঁ।

আপনার অটোবায়োগ্রাফি ইংরেজীতে বেরিয়েছে ?

হ্যাঁ। পড়েছেন ?

ছেলেটি উত্তর দেয়নি। চোখ কুঁচকে ও পথ দেখছিল, পথের মোড়। এক হাতে সিগারেট ধরাল। ওকে অফার করেনি। ছেলেটির মধ্যে যেন সহসা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল। কেন, তা দেবাদিদেব বলতে পারে না। কিন্তু আজকাল ও খুব টের পায় কখন ওর ওপর বিদ্বেষ জমে ওঠে। দেবাদিদেবের রোমকূপ ও চামড়া বেতার তরঙ্গের মতো অনুভূতি-প্রখর হতে থাকে। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে, চায়ের দোকানে—সর্বত্র কেউ না কেউ ওকে বিদ্বেষ ও ক্রোধের চোখে দেখে, দেখে অবিশ্বাসের চোখে।

সব ও টের পায়। সকলকে ও চেনে না। কিন্তু বুঝতে পারে, ওর দিকে সক্রোধে, হিংস্র আক্রোশে দেখছে কেউ না কেউ। দেখছে আর ডিসমিস করে দিচ্ছে। ওকে বাতিল করে দিয়ে ওরা সিনেমা-রাজনীতি-পাড়ার মেয়ের গল্প করে চেঁচিয়ে। বাতিল করে দেয় যারা, তারা অচেনা, কিন্তু বয়সে তরুণ। দেবাদিদেব বুঝে পায় না, তরুণরা ওকে অবিশ্বাস করে কেন ?

ওর মুখে কি লেখা থাকে, ও দেবাদিদেব বসু ? ওর মুখ দেখে কি বোঝা যায়, ওর বৌ ঈপ্সিতা চলতে ফিরতে ওকে খোঁটা দেয় ? ও বোঝে, ওকে ঘিরে একটা তরঙ্গজাল চলাফেরা করে। সে তরঙ্গজালের স্পর্শে লোকে টের পায়, ওকে বহুজন অবিশ্বাস করছে বলে ও দুঃখে মরে থাকে মরমে। সংশয় ও আত্মবিশ্বাসের অভাব

সর্বদা ওকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে। তাও বোঝা যায় ওর দশ হাতের মধ্যে হাজির হলে। সেইজন্যে ওকে দেখলেই অবিশ্বাস, আক্রোশ, রাগ, ডিসমিস। খুব অনিশ্চিত লাগে আজকাল, মাছ কিনলেও মনে হয় মাছওয়ালা বলবে, পয়সা নিন, মাছ ফেরত দিন, আপনি মশাই ডিসমিস্ড মানুষ।

এ রকমটি কোনদিন ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারে। বড় বিপন্ন মনে হয় নিজের অস্তিত্ব। বড় বিপন্ন মনে হয় নিজেকে। কিছু যেন গুছিয়ে ভাবা সম্ভব নয়। বড় সংশয় বড় ভয়। যেন যে কোন সময়ে কে অপমান করে চলে যাবে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে কেউ গায়ে থুথু দেবে, বাস থেকে কেউ টিপ ঠিক করে পানের পিক ফেলবে জামায়, বাস এসেছে দেখলে কেউ ইচ্ছে করেই জ্বলন্ত সিগারেট দেবাদিদেবের টেরি-শার্টে ছুঁড়ে বাসে উঠে পড়বে।

আক্রোশ, বিদ্বেষ, ডিসমিস অর্ডার। মজা হচ্ছে, সব চলে নিঃশব্দে। বাইরে সব অন্যরকম। এত অন্যরকম যে, হয়তো যারা ডিসমিস করে দিচ্ছে, তারা মুখে বলতে পারে, এ কি! এত রোগা হয়ে গেছ? অসুখ করেছিল?—ললিতা যেমন বলেছিল।

মুখে যারা বন্ধুর মতো কথা বলছে, তারাই মনে মনে ডিসমিস করে দিতে চাইছে। নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। এ কি ভীষণ ষড়যন্ত্র? তবে কি কাফকার গল্পগুলোই সত্যি? সেসব গল্পের দুঃস্বপ্নকে সত্যি করে তোলার জন্যেই এতদিন ধরে আয়োজন চলেছে? কিন্তু তাই যদি হবে, তবে তো বিশাল ধুমধামে টুনি-বাতিতে শহর জ্বালিয়ে উৎসব হওয়া উচিত। দেবাদিদেব একা কেন মরবে? একটা বলিতে এতবড় পূজো হয় কখনো?

সেইজন্যেই পালিয়ে আসা। হারিয়ে যাচ্ছে অস্তিত্ব। যা-যা করেছে দেবাদিদেব সব ভুল, সব ঈপ্সিতার ভাষায়, 'সুপরিকল্পিত বদমায়েসি'। কিন্তু এই ছেলেটির ভেতর থেকে বিদ্বেষ বেরিয়ে

আসছে কেন ? এ তো পাঞ্জাবী, তরুণ অফিসার, দেবাদিদেবের সম্পূর্ণ অচেনা, অন্য জগতের, অন্য মানুষ ?

কালাটোপ পৌঁছে গেল ওরা। দেবাদিদেব নেমে দাঁড়াল। ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিতে গেল। ছেলেটি অদৃশ্য বন্দুকে ওর কথা বাতাসেই বিঁধে দিল আধপথে। দেবাদিদেবের ধন্যবাদের কথা হঠাৎ আছড়ে পড়ল গুলি খেয়ে। ছেলেটি বলল, শঙ্কর দয়াল আমার বন্ধু। জানলে আমি আপনাকে গাড়িতে তুলতাম না।

দেবাদিদেব দাঁড়িয়ে রইল। সাইকেলের চেন জড়ানো গাঁটে ওর মুখে যেন ঘুষি মেরে গেল ছেলেটা। মুখ থেঁতো, অদৃশ্যে রক্ত পড়ছে। সভয়ে দেবাদিদেব মুখে হাত বোলাল। ভয়, ভীষণ আতঙ্ক। ছেলেটা চলে যাচ্ছে। ওর ঘাড় কার মতো দেখতে যেন ! কে ওরকম ঘাড় নুইয়ে ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলে যেত ? কে সে ? দেবাদিদেব মনে করতে পারল না। কিন্তু ওর ভেতরে দুঃখ গুমরে উঠল। ছেলেটার ঘাড় কার মতো, তা মনে পড়ার আগেই দেবাদিদেবের মনে অতর্কিতে স্নেহের অনুভূতি এসেছিল। ছেলেটার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে গিয়েছিল। ছেলেটা তা জানল না। ওর ওপর নির্মম আক্রোশ ও অবিশ্বাস নিয়েই চলে গেল। যাকে তুমি মুহূর্তের বা চিরকালের বন্ধু করতে চাও, সে তোমার মনের আসল কথা ধরতে পারে না। ধরতে চায় না। এইগুলো আজকের পৃথিবীতে মানুষের জীবনের খুব বড় ক্ষতি। কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। ছুঁতে চায় না। পাশাপাশি হাঁটতে পারো, জীপে বসতে পারো ঘন হয়ে ঘেঁষে। কিন্তু দুজনের মাঝখানে দুই নক্ষত্রের মধ্যবর্তী মহাবিশ্ব-দূরত্ব থেকে যায়। দুটো নক্ষত্র কচিৎ, বহু মিলেনিয়াম বছরে কাছে এলে তাকে দুর্ঘটনা বলে ধরতে হবে। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তা থেকে কোন নিয়মের সূত্র বের করা সম্ভব নয়।

কিন্তু ছেলেটি ওকে ডিসমিস করে দিয়ে চলে গেল কেন ? শঙ্কর দয়ালের বন্ধু বলে ? শঙ্কর দয়ালের কি করেছে ও, যে শঙ্করের বন্ধু দেবাদিদেবকে ঘৃণা করে ? কেন ঘৃণা করে ?

শঙ্কর দয়াল !

'শঙ্কর দয়াল। উচ্চতা পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি। রং ফর্সা। নাকের ওপরটা চাপা, ঠোঁট মোটা। নিগ্রয়েড চুল। চোখ বাদামি। সনাক্ত করবার চিহ্ন, বাঁ ভুরুর ওপরে কাটা দাগ। ছোটবেলায় পড়ে গিয়েছিল। জন্ম দিল্লীতে। বাবা কৃষিদপ্তরে করণিক। জনৈক মামার আনুকূল্যে হায়দ্রাবাদে লেখাপড়া করে ও অর্থনীতিতে এম. এ, পড়ে। সেই সময়ে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গোপাল কৃষ্ণানের সঙ্গে। গোপাল কৃষ্ণান অন্ধ্রের ইন্দ্রপুরম্ এজেন্সিতে পার্বত্য আদিবাসী. গিরিজন বেল্টে কাজ করত। পরে সে গিরিজন বিদ্রোহে নেতা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৯ সালের গিরিজন আন্দোলনে গোপাল কৃষ্ণান প্রভৃত মদত দেয় এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে গিরিজন বেল্টে বাস করতে থাকে। শঙ্কর দয়াল এই গোপাল কৃষ্ণানের সঙ্গে চলে যায় কারকোণ্ডা গ্রামে এক ছুটিতে, এবং রাজনীতিতে উগ্রপন্থী হয়ে ফিরে আসে ছুটির পর। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সে। চমৎকার ইংরেজী লেখে, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন কাগজে দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য গ্রামীণ অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ উচ্চ প্রশংসিত হয়। গোপাল কৃষ্ণানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতায় মামা ভয় পান এবং চেষ্টাচরিত্র করে দিল্লীর এক প্রকাশক সংস্থায় কাজ জোগাড় করে দেন। দিল্লীতে গিয়ে শঙ্কর দয়াল অত্যন্ত তড়িঘড়ি নরসিংহম্ পিল্লাই, অমিতাভ দাবে, আনন্দ রায়. এদের. সঙ্গে ভিড়ে পড়ে ও 'দি লান্সার' নামে এক কাগজ বের করতে থাকে। উক্ত কাগজের উদ্দেশ্য সাহিত্যচর্চা বলে বিজ্ঞাপিত হলেও, গোপাল কৃষ্ণানের মতো আরো-আরো উগ্রপন্থীদের গল্প ও কবিতার অনুবাদ ছাড়া সে কাগজে কিছুই বেরোয় না এবং শঙ্কর দয়ালের অনুবাদ প্রভূত খ্যাতি লাভ করে।'

অসামান্য অনুবাদ করত। সেটা ১৯৭৫ সাল। জরুরী অবস্থা চলছে। এতকাল আগের কথা মনে হয় কেন? এখন, এই মুহূর্তে তো ১৯৭৬ সাল। জরুরী অবস্থা এখনো তো আছে। কেন

দেবাদিদেবের ভীষণ ভয় হয়, একদিন দেখবে জরুরী অবস্থা আর নেই ?

অসামান্য অনুবাদ করত শঙ্কর। সেই জন্যেই দেবাদিদেব ওকে দিয়ে নিজের আত্মজীবনী ইংরিজীতে অনুবাদ করতে চেয়েছিল। ওর ইংরিজী বইয়ের পাবলিশার কমলেশ জৈনকে ও বলে, শঙ্কর দয়ালকে দিয়ে অনুবাদ করাও।

শঙ্কর দয়াল ?

তোমার সঙ্গে আলাপ নেই ?

তা আছে।

তাহলে ?

ও বড় জেদী ছেলে।

আরে, নিশ্চয় করবে।

দেবাদিদেব ভেবে পায়নি, কমলেশের দিক থেকে ইতস্তত কেন ? দেবাদিদেব বসুর আত্মজীবনী অনুবাদ করতে পেলে শঙ্করের সেটা সৌভাগ্য বই কি। কমলেশ বলে, ওর সঙ্গে কথা বলি।

কয়েক দিন বাদে কমলেশ বলল, শঙ্কর আমার আপিসে আসবে, আপনিও আসুন।

শঙ্করকে দেখেই ভয় পেয়েছিল দেবাদিদেব। বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেলে এ-রকম ভয় হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী তরুণদের দেখলে ভয় করে। ওরা এত আত্মবিশ্বাসী কেন ?

শঙ্কর কিছুতে কাজের কথায় আসতে চাইছিল না।

আচ্ছা, কি করে এটা করেন বলুন তো ?

কি করি ?

যখন ক-বাবুর কাগজে লেখেন, তখন রসাল, গ্যাদগেদে, গ্যাঁজানো গল্প লেখেন। যখন খ-বাবুর কাগজে লেখেন, তখন দারুণ কমিটেড গল্প ছাড়েন। একেবারে দোকানী মনোভাব।

এ তুমি ঠিক বললে না।

কেন? বুঝিয়ে দিন।

লেখা তো মনের মধ্যে তৈরি হয়। যখন যে লেখাটা এসে গেল···

প্লীজ! এখন আর ও প্রেরণার থিওরি চালাবেন না।

তুমি আমার লেখা পড়?

না।

ইংরিজীতে বেরোয় তো?

আপনার লেখা পড়া সম্ভব কি?

তোমার মতো একটি ছেলেকে নায়ক করে···

জানি 'শরতের পর শীত'—কিন্তু হয়নি।

বইটা কিন্তু···

প্রশংসা পেয়েছে, এই তো? ওটা আমার কাছে কোন যুক্তি হল না। আপনি এক স্বার্থের দ্বারা ক্রীত, আপনার পোষা পাঠকরা আপনাকে নিয়ে হইহই করবেই তো। থাক গে ওসব কথা।

আমি কিন্তু তোমার অ্যাডমায়ারার।

সে আমার দুর্ভাগ্য।

আমি ভাবছিলাম······

আপনার আত্মজীবনী?

হ্যাঁ।

আপনি চান, আমি সেটা অনুবাদ করি?

হ্যাঁ।

কেন চান?

তুমিই পারবে ভাই, আর কেউ পারবে না।

কেন? এস্‌টাব্‌লিশমেন্টের পোষা বিদ্রোহী লেখকের কৌশলী আত্মজীবনী অনুবাদ করার জন্যে পোষা অনুবাদক পাওয়া যাচ্ছে না? রবি চৌধুরী আছে তো। সমস্ত বড় বড় কাগজের পোষা আরেক বিদ্রোহী?

তুমিই কর।

আপনি আমাকে জানেন না, চেনেন না। আমার ধারণা, আপনি ইংরিজী পড়লেও ভালো বোঝেন না। আমার ধারণা, ইংরিজীটা ইংরিজী হল কিনা, তা আপনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে জেনে নেন। আমার আরো ধারণা, ইদানিং আমার কয়েকটা অনুবাদ খুব নাম করেছে বলে শুনেছেন। আপনি জানেন, বামপন্থী নতুন জেনারেশন আপনাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। আমাকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে আপনি তাদের কাছে পাত পেতে চান। না, আমি ওসব কারবারে নেই মশাই।

দেবাদিদেব বুঝতে পারছিল না, কেন তবু ওর মনে এমন জেদ চেপে বসেছিল। কেন মনে হচ্ছিল, যে করেই হোক, ওর কাছে স্বীকৃতি পেতেই হবে।

কমলেশ হাসছিল বসে বসে।

তুমি একটু ভেবে বল শঙ্কর।

আপনি আমার কোন লেখা পড়েছেন?

তোমার কবিতা?

সে তো গদ্য নয়।

গোপাল কৃষ্ণানের গল্পের অনুবাদ।

আপনি তার নাম করছেন?

সে তো অত্যন্ত গর্ব করবার মতো মানুষ।

শঙ্কর বলেছিল, সেশানটা খুব জমেছে কমলেশ। এখন, এই সেশান চালিয়ে যাবার সুবিধার্থে আমি গোপাল কৃষ্ণানের সত্যি গল্পটা বলতে চাই। আপনি মন দিয়ে শুনুন।

কমলেশ বলল, বল হে ইয়ার।

বলছি। গোপাল কৃষ্ণান ছিল কারকোণ্ডা গ্রামের কিংবদন্তী। গিরিজন সংগ্রামের নেতা। ১৯৫৯ সালে ইন্দ্রপুরম্ এজেন্সিতে গিরিজন সংগ্রাম শুরু হয়। গিরিজনরা পার্বত্য আদিবাসী। জঙ্গলমহালের

অফিসাররা ওদের চাষ-আবাদ পদ্ধতিতে বাধা দেয়। ইন্দ্রপুরম্ এজেনসির কথা জানো ?

তুমিই বল।

সাতশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে তার সীমানা। তিনশো গ্রাম তাতে, লোকসংখ্যা দুই লাখ। অন্ধ্রের জনসংখ্যার ০.৫ ভাগ।

দেবাদিদেব মনে মনে নোট করল, শঙ্কর দয়ালের হোমওয়ার্ক কতখানি পাকা। নিজে না জানলে এত কথা জানা যায় কি ?

পার্বত্য আদিবাসীরা জঙ্গলমহালের কাছে সুবিচার চেয়েছিল, আর চেয়েছিল মহাজন জোতদারের কাছে। ওরা যখন খেতমজুরের কাজ করত, দিন আট আনার বেশি মজুরী পায়নি, বছরে উনষাট কিলোর বেশী খাদ্যশস্য পায়নি। মহাজন ও জোতদাররা সময় ফুরোলে ওদের বন্ধকী জমি ফিরিয়ে দেয়নি, গিরিজনদের পক্ষে আইন-আদালত করা তখন অসম্ভব ছিল। সরকারের ওপরেও গিরিজনদের রাগ ছিল। শিফটিং কালটিভেশন ও মদ চোলাইয়ের কারণে সরকার ওদের ওপর খাপ্পা ছিল। সরকারের চোখে ওরা ক্রিমিনাল।

সে সর্বত্র, জানো শঙ্কর ?

আমি একটি বেল্টের কথা শুনেছি।

কমলেশ বলল, এই সব কথা এখানে বলবে ইয়ার ?

ও, ইয়েস।

বল। গল্পই তো বলছ।

গোপাল কৃষ্ণান সে সময়ে কলকাতা আসে। দেবাদিদেব, চমকে উঠলেন কেন ? আপনিও তার সঙ্গে দেখা করেন। সে এসেছিল অন্য কাজে। এসেছিল কারো কাছে গাইড লাইন নিতে। ওকি ! ঘামছেন কেন ?

না, বল।

তার ছুটো গল্প আপনার কাছেও ছিল। ইংরিজী অনুবাদ।

সে গুলো…

সুখের বিষয়, আপনি সে গুলো চেপে দিতে চেষ্টা করলেও, আমিই অনুবাদ করি, আমার কাছেও কপি ছিল। ফলে 'আম্মা চেট্টির মা' আর 'আমার ছেলে' গল্প ছুটোই সংকলনে বেরিয়ে গেছে।

বল, বল শঙ্কর…

গোপাল আপনার সঙ্গে কেন দেখা করেছিল জানেন ?

না।

আপনার সম্পর্কে ওর ধারণা খুব বড় ছিল।

ওঃ…

আমার সঙ্গে ওর আলাপ তার পরে-পরেই। ও আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। খুব হাসতে পারত। ওর স্ত্রী কুন্তীও ছিল ওর যোগ্য কমরেড। অনেক কথায় যাব না। বাহাত্তর সালে ওরা ধরা পড়ে।

জানি।

জানবেনই তো। আপনাকে তো সবই জানতে হয়। না জানলে সে বছর পূজোর সময়ে 'গোপাল আমার ভাই' লিখবেন কি করে ?

শঙ্কর, তুমি বড় নির্দয়।

হয়তো তাই। কিন্তু আপনি বড় বিচলিত হচ্ছেন।

আমি···

গোপাল আর কুন্তী কি করে মারা যায় জানেন? ওদের নিয়ে যাওয়া হয় রাংগালে—সমুদ্রের ধারে। পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে ওদের গুলি করা হয়। গোপাল আর কুন্তীর লাশ জলে ফেলে দেওয়া হয়। সমুদ্র ওদের ফেরত দেয়।

জানি। মানে, পরে জেনেছি।

গোপাল ছিল লেখক সমিতির সদস্য। দিল্লীতে ও সভাসমিতিও করে গেছে কয়েকবার। কমলেশ, গোপালের মৃত্যুতে প্রতিবাদ জানাতে আমি ভারতের অগ্রগামী লেখকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম। দেবাদিদেব তাতে সই করেননি।

শোনো শঙ্কর, তার মধ্যে কথা আছে···

সই করেননি, এবং সে কথা আত্মজীবনীতে স্বীকারও করেননি। আপনার আত্মজীবনীতে গোপাল আপনার সুবিধেমতো এসেছে এবং গিয়েছে। আপনি আর সব কিছুর মতো গোপালকেও ব্যবহার করেছেন আত্মজীবনীতে। সব কিছুই আপনার ব্যবহারের জন্য।

শোনো শঙ্কর, একটু শোনো···

না দেবাদিদেব, কোন কোন অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি গোপাল কৃষ্ণানের মৃত্যুর প্রতিবাদে সই দেবেন না, কেন না, আপনাকে সরকার দরকারী কাজে লাগিয়ে রেখেছে। লেফ্‌ট রাজনীতির ছেলেদের মধ্যে যারা লেখে, তাদের স্ক্রীণ করেন আপনি।

বড্ড বেশি বেশি বলছ শঙ্কর।

প্রমাণ চান?

তুমি সানন্দ রায়ের কথা শুনে এ সব কথা বলছ।

অতএব সানন্দ রায় বিশ্বাসযোগ্য নয়?

সানন্দকে তুমি বিশ্বাস কর?

বুঝলাম।

কি বুঝলে ?

দিল্লীতে আপনি কেন এসেছেন।

না শঙ্কর, না।

ও সব কথা দেবকী ব্যানার্জিকে বলবেন।

আমাকে তুমি ভুল বুঝে যাচ্ছ।

গোপাল কৃষ্ণান সম্পর্কে মিছে কথা লিখেছেন কেন ?

সদাশিব চেট্টির জন্যে। সব কথা লিখলে আজকে সদাশিব চেট্টি কাজ করে চলতে পারত কি ?

আহ্, আহ্, আহ্! কি দুঃখের কথা ? ব্যানার্জিও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না।

কি বলছ ?

সদাশিব চেট্টি গ্রেপ্তার, নিহত, খণ্ড-বিখণ্ড, রাংগালে শিয়ালে-শকুনে তার মাংস দিয়ে ভোজ লাগিয়েছে।

না!

তেরো তারিখে। আজ সতেরই।

অথচ সেজন্যেই আত্মজীবনীতে···

নিজেকে সৎ প্রতিপন্ন করার এই হাস্যকর প্রচেষ্টা কেন ? আপনার মত কে না জানে ? কখনও আপনি সাচ্চা ছিলেন, আজ আপনি ঝুটা এবং জুঠা। আপনি গোপাল কৃষ্ণানের কথা যেমন অর্ধেক বলেছেন, অর্ধেক এড়িয়ে গেছেন, তেমনি···নিশ্চয়···আপনার আত্মজীবনীও অর্ধসত্যে বোঝাই ?

তুমি ভুল করছ।

কমলেশ জানত, আমি আপনার বই অনুবাদ করব না। শুনুন, আমি ওকে বলেছিলাম আমাকে বইটা দাও, যাতে আমি আপনার সামনে বসে কথা বলতে পারি। আপনাব মতো লোকদের আমি ঘেন্না করি মশাই। কবে দুটো সত্যি কথা লিখেছিলেন, তাই

ভাঙিয়ে আজ আপনারা একদিকে সৎ, বিবেকী, কমিটেড বলে মানুষের শ্রদ্ধা পেয়ে চলতে চান। অন্যদিকে পাওয়ার-মঙ্গারিং করেন! আপনার মহান লেখকের আত্মজীবনী আমার কাছে, দেবাদিদেব বোস্, চোতা কাগজ ছাড়া কিছু নয়।

শঙ্কর দয়াল কমলেশকে 'যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজার সামনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে ছিল, কমলেশ ও বই অনুবাদ করাবে, ছাপবে। ও তো প্রকাশক। যা বিক্রি হয় তাই ছাপে। তবে জেনে রাখবেন, ও পর্যন্ত আপনাদের নিয়ে হাসে।

শঙ্কর চলে গিয়েছিল। কমলেশ জৈন বলেছিল, বেজায় রাগী বদমেজাজী ছোকরা।

তুমি জানতে ও অনুবাদ করবে না? জেনে শুনে তুমি আমাকে এই অপমানটা করালে?

কমলেশ বলেছিল, আপনিও তো অন্যদেরই মত। সবসময় আপনি যা করবেন সবাই তা সমর্থন করে চলবে? কেউ বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে পারবে না?

শঙ্কর নিজের মতে বিশ্বাস রাখার অধিকার রাখে।

তুমি ছাড়াও আমার প্রকাশক আছে।

কেউ আমার মত টাকা দেবে না। তা ছাড়া, এত বিজ্ঞাপন দেবে কে?

তুমিও আমাকে নিয়ে......

আচ্ছা দাদা! এ বড় হাসির ব্যাপার। আমি তো জানি, আপনি সব জায়গায় প্রকাশকদের গোমুখ্যু, মাবোয়াড়ী মেণ্টালিটির লোক বলেন। কিসে মজা লাগে জানেন? আপনি মনোপলি প্রেসকে গাল দেন, প্রকাশককে গাল দেন, হয়তো এস্টাব্লিশমেণ্টকে গাল দেন......আপনি মানে আপনারা। অথচ এই মনোপলি প্রেস, এই প্রকাশক, এই এস্টাব্লিশমেণ্ট ছাড়া আপনাদের চলে না।

তুমি কি বলতে চাও......

শুনুন, আপনারা কেন এ সব করেন আমি বুঝি। পাওয়ার বিল্‌ড করতে চান? সত্যি বলতে কি, আপনি পাওয়ার বিল্‌ড করছেন বলেই আপনাতে আমার এত আগ্রহ। আমি যোগ্যতায় বিশ্বাস করি···আপনাকে বিশ্বাস করি।

শঙ্করকে?

অন্যভাবে বিশ্বাস করি। ওর কথা ভুলে যান। আপনি যা-যা চান, ও তা চায় না। আমি জানি, ও কোনদিন আপনি যে পাওয়ার চান, তা চাইবে না। তাই ওকে বিশ্বাস করি। তা ছাড়া, গোপালকৃষ্ণানকে এখনো ও ভুলতে পারেনি।

অসম্ভব আঘাত লেগেছিল মনে। কমলেশ জৈন ওকে বিশ্বাস করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে শঙ্করকে। বোঝাই গেল দেবাদিদেবকে ও ভবিষ্যতের অথবা হয়তো বর্তমানেরই এক ক্ষমতাবান সাহিত্যনেতা বলে মনে করে বলে বইটা ছাপছে। কেন? কেন দেবাদিদেব শঙ্কর দয়ালের মত শ্রদ্ধা পাবে না?

শঙ্কর দয়াল এখন কি করে?

আপনার জানা উচিত।

কি করে?

নরসিংহম্ পিল্লাই, শঙ্কর, অমিতাভ দাবে, সানন্দ রায়, এরা কাগজ বের করছে না? সানন্দ তো কলকাতার ছেলে।

শঙ্কর দয়াল! তখনি মনের নিচে ভীষণ ক্রোধ জন্মেছিল। মনের চামড়া বিষিয়ে গিয়েছিল কুচিলা বিষে। তখনি কিছু করেনি। না, কোন সুপরিকল্পিত অভিসন্ধিও ছিল না। কিন্তু পরে, বড়-সড় এক পার্টিতে বহুজনের মধ্যে, মদের নেশা না চড়তেই শঙ্কর দয়ালকে ডেঞ্জারাস পোটেন্‌শিয়াল এনিমি শুড বি ওয়াচড্‌, এই সব কথা বলেছিল বলা ভুল হবে। শব্দগুলো আপনার তাগিদে তৈরী হচ্ছিল ভেতরে, বেরিয়ে আসছিল মুখ দিয়ে। দেবাদিদেব বলছিল, ও ভাবে, আমি তুমি সব বিট্রেয়ার—গোপালকৃষ্ণানের মৃত্যুর পর সই দিইনি

বলে। নিজে বুঝতে পারছিল, অন্যায় হয়ে যাচ্ছে ভীষণ, ক্ষতি করা হচ্ছে কারো, অনুশোচনা হচ্ছিল সেজন্যে, অথচ থামতে পারছিল না। দেবকী ব্যানার্জি প্রত্যেকটি কথা শুনছিল মন দিয়ে। তাতা মিত্তির দেবাদিদেবকে থামাবার চেষ্টা করছিল।

দেড় মাসের মাথায় শঙ্করদের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর সে তো দীর্ঘ অন্ধকারে চলে গেল। আজও আছে। শঙ্করের বন্ধু ওকে ডিসমিস করে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু ছেলেটার ঘাড় কার মত? কে ওর মত মাথা নিচু করে আস্তে হেঁটে চলে যেত? মনে আসে, মনে আসে না। সেই মনে-না-পড়া মানুষটার স্মৃতি দেবাদিদেবের মনের এরিয়ালের কাছ দিয়ে কাটা ঘুড়ির সুতোর মত ঘুরছে আর ঘুরছে। এরিয়ালে আটকে যাচ্ছে না কিছুতে।

ঘরে এল দেবাদিদেব। চৌকিদারকে বলল রান্না করতে। বাইরে এসে দাঁড়াল।

বড় নৈঃশব্দ্য চারিদিকে। বড় অসীমবিস্তারী পর্বতমালা, বরফে অস্তমান সূর্য জ্বলছে। বড় বেশি পাখি সায়াহ্নে কুলায় ফিরছে। বড় বেশি সংখ্যায় ঋজু-ঋজু ওক, পাইন ও ফার মাথা তুলে সন্নত মহিমায় সন্ধ্যাকে গ্রহণ করছে পাতায়-পাতায়।

প্রকৃতিতে এত বেশি-বেশি কেন সব? কেন এত অপচয়? সন্ধ্যা তো রোজ হয়, রোজ হবে। তাকে অভ্যর্থনা ও বিদায় জানিয়ে রাতকে গ্রহণ করতে কেন এত আয়োজন?

দেবাদিদেব নৈঃশব্দের মানুষ নয়। বদ্ধ ঘর, বহু মানুষ, শব্দ ও চড়া আলোয় অভ্যস্ত দেবাদিদেবের আঙুলে নার্ভাস ট্রেমর শুরু হল। বড় বেশি কথা কওয়া হয়েছে, বড় বেশিবার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্ব ঝলসে দিয়ে গেছে ওর সর্বজন-পরিচিত বিশ্বস্ত মুখ। সে মুখে একই ভাবাভিব্যক্তি ধরা থাকে। সম্পদে-বিপদে, বন্ধুর মৃত্যুতে—প্রেস সম্মেলনে—এয়ার পোর্টে-বাজারে-পথে-ট্রামে-ট্রেনের জানলায়-কমিটি মিটিঙে—ডেন্‌স্টেশনে—প্রতিবাদ সভায় সে-মুখ একই রকম

থাকে। পরুষ গম্ভীর, রুক্ষ, বিষণ্ণ, কখনো কেউ তাকে হাসতে দেখেনি।

দুই

আজ নৈঃশব্দ্যে, রূপা গলানো আশ্চর্য সন্ধ্যায়, গাছগুলি যখন ধূসর-সবুজ, তুষারমৌলী আদিম হিমালয়ের সামনে বসে থাকতে বোবায় ধরছে, অস্বস্তি হচ্ছে, হাঁপ ধরছে বুকে। নিশ্বাস নিতে কি কষ্ট, বাতাসে যেন ওজোন্ নেই। কথামৃতের গল্প। মেছুনীর ঘুম আসেনি পদ্মগন্ধী বাতাসে। আঁশ-চুপড়িতে জল ছেটাতেই ঘুম এসেছিল। পাহাড়ের দেওদার গাছের গায়ে ধূপগন্ধী নির্যাস ঝরে। বাতাস ধূপগন্ধী। তবু ঘুম নেই, ঘুম আসছে না। কাচের জানলার ওপারে তারাগুলি জ্বলছে। ঘুম নেই কেন? বাতাসে ওজোন্ নেই কেন? নির্জনে এসে আত্মানুসন্ধানের ব্যাপারটাই একটা গ্যাঁজা। গ্যাঞ্জাম। যার যা সয়। আজ কতকাল দেবাদিদেব এক ঘণ্টাও একা থাকে না। সভা-সমিতি-সেমিনার-ডিনার-লাঞ্চ-ককটেল-আড্ডা—উইকএন্ড্ পার্টি—বাড়িতে জমায়েত। আজ কতকাল দেবাদিদেব স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে খায় না। ঈপ্সিতা ছেলেদের সঙ্গে খেয়ে নেয়। ওকে দোষ দেওয়াও যায় না। দেবাদিদেব বাড়িতে খায় না প্রায়ই। নেমন্তন্ন থাকে। ঈপ্সিতা সে সব নেমন্তন্নে যায় না। শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা বসুর যুক্ত নেমন্তন্নে শ্রীযুক্তা বসু যে যাবেন না, তাও সবাই মেনে নিয়েছে।

নিশ্বাস নিতে বড় কষ্ট। বাতাস বড় বেশি মুক্ত ও পবিত্র। এর চেয়ে অনেক বেশি ওজোন্ মেলে বদ্ধ ক্লাবঘরের মদ ও ধোঁয়াগন্ধী বাতাসে। অনেক বেশি স্বস্তি মেলে, যদি দেবাদিদেব চামড়া-মোড়া চেয়ারে বসে থাকে, স্তাবকরা বসে থাকে সামনে।

কিন্তু আকাশের নিচে নিজের মুখোমুখি বসে থাকতে না পারলে দেবাদিদেব ঘরে ফিরবে কি করতে? ঘরে ফেরা যে একান্ত দরকার। ঘরে ফেরা মানে একদার সততায় ফিরে যাওয়া। গোপাল কৃষ্ণান সম্বন্ধে নিজে যা জানো, তা চেপে দিয়ে আত্মজীবনীতে অন্য কথা লিখলে ঘরে ফেরা সম্পূর্ণ হয় না। শঙ্কর দয়ালকে মিসা করে দিয়ে গোপনে তার দুঃখে কষ্ট পেলে, তার বই কিনলে ঘরে ফেরা সম্পূর্ণ হয় না।

ঘরে ফেরা মানে, বিবেকের আয়নায় নিজের নগ্ন চেহারা দেখে চোখ মেলে থাকা। ঘরে ফেরা মানে, ঈপ্সিতার ভাষায় সব 'ফ্যাসাদ' ফেলে দিয়ে অতীতের মত সৎ ও সংগ্রামী লেখক হওয়া। ঘরে ফেরা মানে, কাছের ও দূরের মানুষদের চোখে বিশ্বাসভাজন হওয়া। ঘরে ফেরা আজ বড় কঠিন। বড় জটিল ও কণ্টকাকীর্ণ হয়ে গেছে ঘরে ফেরার পথ। কত কাঁটা দেবাদিদেব নিজেই বুনে দিয়েছে ফেরার পথে?

না-না, ঈপ্সিতা বিশ্বাস করুক, দেবাদিদেব নিজেও জানত না, কাঁটা বুনে-বুনে সে ঘরে ফেরার পথ দুর্গম করছে। জানত না, অসদাচরণ করছে। জানত না, অবিবেকী কাজ করলে ঘরে ফেরার পথে কাঁটা বুনে দেওয়া হয়। অসিপত্রবন নরক সৃষ্টি করা হয়। একুশ নরকের মধ্যে আছে অসিপত্রবন নরক। পাপীর আত্মা সে নরকের পথ ধরে এগোতে থাকে। দু'পাশে অসিধার পাতার বন। পাতাগুলি ঝুঁকে পড়ে পাপীকে রক্তাক্ত করতে থাকে।

দেবাদিদেব এত কথা জানত না। সে জানত, ঘর ছেড়ে বেরোলে ভয় নেই। কারো স্নেহের ডাকে সর্বদা ঘরে ফেরা যায়। ছোট বেলা দেবাদিদেব খুব ভালো ছিল। মা ডাকলেই ঘরে ফিরে আসত। ওর শৈশবে ওরা থাকত পদ্মানদীর ধারে ছোট একটা শহরে। ওদের বাড়ির সামনে ছিল ধূ-ধূ মাঠ। মাঠের বুকের সরু পথটি যেন ওর মায়ের ঘন চুলের মাঝে সরু সিঁথিখানি। সন্ধ্যেবেলা মা দরজার ঝনকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ডাকতেন, দেবু, ঘরে আয়।

ঘরে ত ফিরতে চায় দেবাদিদেব। ও কি বোঝে না যে, দিনে দিনে ও কি রকম অরণ্যদেব হয়ে যাচ্ছে? আনরিয়াল? অনেক আগে জীবন কত সরল ছিল? তখন দেবাদিদেবও বিশ্বাস করত অন্যদের মত যে বিপ্লব এসে গেছে। এসে গেছে সমাজতন্ত্র, সবাই বাস করবে কম্যুনে, জীবন হবে সম। জেলায় জেলায় কম্যুন হয়েছিল। রংপুর তখন রেড রংপুর। আশ্চর্য গান গেয়ে গিয়েছিল সুবিনয়, আশ্চর্য গাইত রেখা। সুবিনয়ের বোন। সুবিনয় মরে গেছে পথের দুর্ঘটনায়। যাদের সঙ্গে দেবাদিদেব পথ চলতে শুরু করেছিল, তারা সবাই মৃত। 'সাথী! সাথী! কাঁধে কাঁধ মেলাও' গানটি কার লেখা যেন? বরুণের। বরুণ কিন্তু মরে যায়নি। এখনও সে লিখছে, লেখে। হাসলে বরুণের চোখ দুটো সর্বদা কুঁচকে যেত। মনে হত, খুব ছোট ছেলে হাসছে। আরো কতজন! মিছিলে দেখা মুখ সারে-সারে, চেনা-চেনা মুখ। বরুণ সেদিন ওকে দেখে কি রকম অচেনা-অচেনা ব্যবহার করল। করে, সবাই করে। সেই জন্যেই ত দেবাদিদেব চেনা মানুষদের কাছে যেতে ভয় পায়। নতুন মানুষদের সঙ্গে থাকা অনেক স্বাস্থ্যকর। একবার ঘরে ফিরতে পারলে দেবাদিদেব আবার বরুণের কাছে যেতে পারবে।

কিন্তু ঘরে ফেরা কি অতই সোজা? সমস্ত ব্যাপারটি যদি অন্য রকম হত? অন্যরকম ঘরে ফেরা? আমেরিকার নিগ্রো যেমন করে ঘর খুঁজে-খুঁজে আফ্রিকায় পৌছয়? সে রকম হলে ব্যাপারটি অনেক সোজা হয়ে যেত। সে কঠিন কাজও অনেক সোজা। দেবাদিদেব ঘরে ফিরতে চায়, যে-ঘর সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে।

খুবই সত্য কথা। এই ঘরে ফেরার সিদ্ধান্তও সে নিজে নেয়নি। ব্যাপারটি অন্য ভাবে ঘটে যায়। বছর দশেক আগে ওকে ডেকে পাঠায় বিপুল মিত্র। পশ্চিমবঙ্গের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

বিপুল মিত্র ওকে বলে, কি ভাবছ?

কি আবার ভাবব?

বিপুলকায় বিপুল মিত্র বলে, অনেকদিন তো লেফ্‌ট-রাইট প্যারেড করলে, এখন রাইট-রাইট করছ, কর। কিন্তু সিরিয়াস কাজ কর কিছু কিছু। এমেচারদের দিন নেই হে।

দুজনের মাঝখানে একটি টেবিল। টেবিলে বহু কাগজপত্র ও ফাইল এবং দুটি গেলাস। স্কচ। বিপুল মিতপায়ী। দেবাদিদেব ওর চেয়ে অনেক বেশি মদ খেতে পারত তখন, কিন্তু খেয়ে কখনো মাতাল হত না। ওর মাতাল না-হওয়ার ব্যাপারটি পাঞ্চজন্য এইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে—যে লোক "পাছে মাতাল হই" ভয়ে ভিটামিন "বি" অথবা মাখন খেয়ে তবে মদ খায়, সে লোক অতীব কাঁচা। নিশ্চয় তার লুকোবার মত অনেক কিছু আছে। কিছু বলে ফেলে, এর ভয়েই ও মাতাল হবার রিস্‌ক নেয় না। মদ খাচ্ছ কেন? নেশা হবে বলে। তেমন ডিসিপ্লিনের মানুষ নও যে প্রত্যহ আঙুল মেপে একই সময়ে মদ খাচ্ছ। খাচ্ছ প্রচুর। সাধারণত পরের পয়সায়। খেয়েও থেকে যাচ্ছ ধূর্ত ও সাবধানী। অর্থাৎ মাতাল হবার সাহস তোমার নেই। আমাদের ওআন অ্যান্‌ড ওন্‌লি ঋত্বিকদার মত দুর্দান্ত মাতাল হবে ও? দেবাদিদেব বসু? নিজেকে নগ্ন শিশুর মত দুনিয়ার সামনে মেলে ধরবে? সে হিম্মত ওর আছে? ঋত্বিকদার নাম করলেই ধার্মিক সাজে লোকটা, বাণী দিতে থাকে?

বিপুল ওকে যথেচ্ছ মদ খেতে দেয় ও সংক্ষেপে স্বীয় বক্তব্য টেবিলে রাখে। প্রথম কাজই হল, বিরোধী ক্যাম্পের সঙ্গে কামারা-দোরি করা। ঢুকে পড় সর্বত্র। তোমার পার্টির দুর্জয় কেল্লা হল কালচারাল ফ্রন্ট। তুমি দেবাদিদেব কালচারাল ফ্রন্টে সি. ইন. সি. হও। সর্বাধক্ষ্য। তোমাকে এখনি পঞ্চাশটা কমিটির মেম্বার করে দিচ্ছি।

হঠাৎ?

এ সব শব্দ দিয়ে কুস্তিবাজি করে কোন লাভ আছে? তুমিও জানো, প্রস্তাবটা হঠাৎ আসছে না। আমিও তাই জানি। আমি

জানি, তুমি সর্বদা চেয়েছ পাওয়ার। আমি তোমাকে পাওয়ার দিচ্ছি দেবাদিদেব।

আমাকে, কেন?

তা, তুমিও জানো।

হ্যাঁ। তখনি দেবাদিদেব নিঃশব্দে অমোঘ ও সর্বশক্তিমান হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রাদের দলে সামিল হয়। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনী কমিটি থেকে প্রতি কমিটির সদস্য ও অত্যন্ত প্রতাপশালী সদস্য।

ঈপ্সিতা বলেছিল, এ তুমি কি করছ?

কেন? এই তো সবে শুরু।

বিগিনিং অফ দি এনড।

না। অপরপক্ষ বুঝতে বাধ্য হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বামপন্থীকে বাদ দিলে চলবে না। আমাকে দেওয়া মানে বামপন্থীকে স্বীকৃতি জানানো।

তুমি কি নিজেকে বামপন্থী মনে কর?

এ কথার পর দেবাদিদেব ভীষণ ক্ষেপে যায়। ঈপ্সিতার সঙ্গে অনেকদিন ভাল করে কথা বলতে পর্যন্ত পারে নি। দেবাদিদেব বলেছিল, আমি প্রমাণ করে দেব, এটা বিগিমিং অফ বিগিনিং।

ঈপ্সিতা বলেছিল, আর তুমি ফিরতে পারবে না।

জীবনটা দু-পয়সার সস্তা রোমান্স নয় ঈপ্সিতা।

সেই দেবাদিদেব আজ ঘরে ফিরতে চায়। কিন্তু ঘরে ফেরা কি অতই সোজা? বিপুল মিত্রের সঙ্গে অলিখিত শর্তে অদৃশ্য কালিতে সই করার পর।

কি সময়ই না গেছে তখন? ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পরে পরেই বুদ্ধিজীবীদের জালে ছেঁকে তোলার প্রোগাম শুরু হয়। "মুক্ত সাহিত্য সংস্থা" কথা কয়টি হেড লাইন। চীনের আক্রমণকে নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে স্বীয় স্বদেশপ্রেমের কথা বলতে হবে। কম্যুনিস্ট বিরোধী শিবিরে সামিল হতে হবে।

সব সাহিত্যিকরা, যাঁরা ম্যাটার করেন, সবাই সামিল হল সেই মর্মে স্বীয় বক্তব্য রাখার দৌড়বাজিতে। অরাজনৈতিক বা দক্ষিণপন্থী বা সুদ্ধ শিল্পবাদীরা শুধু নন, একদা যাঁরা বামপন্থী আন্দোলনে সামিল ছিলেন, তাঁদের নামও দেখা গেল সে সময়ে। বয়স্কদের মধ্যে ভৃগু সান্ন্যাল আর তরুণতরদের মধ্যে অমৃত দত্ত. সেই যে সামিল হলেন দক্ষিণতম শিবিরে, আর মেঝে পেরোলেন না। ভৃগুদা মরে গেছেন, অমৃত আজও টিকে আছে। দেবাদিদেবের মতই সে একলা।

দেবাদিদেবকে সে স্বীকৃতিদানের খেলায় ডাকা হয়নি। ওকে দেওয়া হয় ক্ষমতার টোপ এবং একই সঙ্গে ও দক্ষিণতম শিবিরের বহুলতম প্রচারিত কাগজে নিয়মিত লিখতে শুরু করে। দক্ষিণতম শিবিরে সামিল হয়ে যে কত দুষ্টুমি করে চলতে হত তখন! ওদের বিপ্লবীদের সঙ্গে লেকে ও ময়দানে বাউল-নাচা, সংস্কৃতিমেলায় মঞ্চে বসা—দেবাদিদেবই একমাত্র লোক, যে এসবও করতে পারত, আবার স্ব-দলে চিরকালের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বামপন্থী লেখক বলে কীর্তিত হতে পারত। ওর চেয়ে অনেক কম অসততা করে অমৃত দত্ত অনেক বেশি বদনাম কুড়োয়।

তারপর, তারপর

ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত ওর নয়। ইদানিং পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে যায়। ইদানিং বলতে সত্তর সাল থেকে এই নতুন অধ্যায়ের শুরু। দক্ষিণতম শিবিরে ও তেমন পাত পাচ্ছিল না। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

একটি পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গ্রেট ইষ্টার্ণে এক বিশাল অনুষ্ঠান হয়, তাতে ওর নিমন্ত্রণলিপি পৌঁছয় অনুষ্ঠানের পরের দিন। অনুষ্ঠানে ওকে সম্মানিত প্রধান অতিথি করা হবে বলে ও শুনেছিল। উক্ত সম্মান পায় অমৃত দত্ত।

ফলে ও স্বকীয় সিদ্ধান্তে পত্রিকার কর্ণধারদের ইচ্ছা উপেক্ষা করে সে বছরের পুরস্কার পাইয়ে দেয় সতী গুহরায়কে। পরিণামে, নিমন্ত্রণ

না-পাবার জন্য ওর এই প্রতিহিংসা - এই মর্মে উক্ত পত্রিকায় বহু চিঠি বেরোয়।

প্রবীন সাহিত্যিক তারক গাঙ্গুলির মৃত্যুতে যে সভা হয়, তাতে ওকে একেবারেই ডাকা হয় না। কর্মকর্তারা তারই শিবিরের লোক। তাকে বলা হয়, তুমি এখানে না ম্যানিলায়, জানতাম না।

ফুল্লরা মিত্র, ওর অনুরাগী পাঠিকা ও সান্‌ডে ক্লাবের সভানেত্রী। ফুল্লরার বাড়িতে প্রতি রোববারে উদ্দাম ও হুইস্কি প্লাবিত এক সাহিত্যবাসর বসে। উক্ত ফুল্লরার ছেলে উগ্র রাজনীতিতে সামিল হয়ে নিরুদ্দেশ হলে ফুল্লরা ওকে কিছু না বলে সরাসরি বিপুল মিত্রের কাছে চলে যায়। খবরটি পাঞ্চজন্য, হতভাগা বজ্জাত, ওকে জানিয়ে যায়। ও ফুল্লরার কাছে, ওকে না জানাবার কারণ জানতে চায়। ফুল্লরা স্ব-স্বামীর নাম করে বলে, সানি বলেছে, ইউ হ্যাভ ফলেন ফ্রম্ বিপুল্‌স্ গ্রেস।

বিপুল ওকে বলে, তুমি বড় বদনাম করে ফেলেছ হে। তবে কলকাতায় এখন বেজায় খুনোখুনি চলছে, সাবধানে থেকো। আমার মিনিস্ট্রি নয় যে বলে দেব।

কেন? আমি সাবধানে থাকব কেন?

বললাম, শুনো।

সত্তরে কলকাতায় ও আশেপাশে খুন, সম্মুখ-সংঘর্ষ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। দেবাদিদেব যদিও কলকাতার এক নিরাপদ অঞ্চলের বাসিন্দা, তবুও তরুণদের এই মৃত্যু-উৎসবে তার মনে সবিশেষ ধাক্কা লাগে এবং ও অনুপম চাকলাদারের কাছে দৌড়য়।

বলে, অনুপম লাইনটা কি?

কিসের লাইন?

পার্টি লাইন।

কি বিষয়ে?

এই নকশাল ছেলেদের হত্যা? মন্ত্রীসভায় তো আমাদের পার্টিও আছে। কোন বক্তব্য নেই কেন?

কে বলল বক্তব্য নেই? পড়ে দেখ।

কাগজের কাটিং। সত্তর সাল। ১০ই জানুয়ারি। দেবাদিদেব পড়তে থাকে। তার পার্টির অন্ধ্রপ্রদেশ কাউন্সিলের সাবকমিটি শ্রীকাকুলামে পুলিসী অত্যাচারের তদন্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকা ভ্রমণ করেছে ও রিপোর্ট দিয়েছে, নকশাল আন্দোলন বিশাল পিছু-ধাক্কা খেয়েছে এবং এখন তো স্পষ্টই অস্ত যাচ্ছে।

রিপোর্ট—"বড়-বড় নকশাল নেতাদের মধ্যে কয়েকজন হয় পুলিসের গুলিতে নিহত অথবা বন্দী। গত ছ-মাস নকশালদের কাজকর্ম বন্ধ, কারণ প্রচুর সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন আছে ও পুলিস অঞ্চল চিরে-চিরে অপারেশন চালাচ্ছে। এর আগে নকশালদের সপক্ষে জনগণের কাছ থেকে যে অংশগ্রহণ ও সমর্থন মিলেছে, এখন তা অনুপস্থিত।"

কমিটিটি নকশাল নেতাদের কাছে আবেদন জানায়, তাঁরা যেন বর্তমান পন্থার সংগ্রামপদ্ধতি ত্যাগ করেন। সংগ্রাম পদ্ধতিটি কাজে লাগাচ্ছে জোতদার, মহাজন ও সরকার। কাজে লাগাচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমূহ দমনে এবং জনগণকে অসীম যন্ত্রণায় ফেলায়।

কমিটি সরকারকে বলে, তথাকথিত উপদ্রুত অঞ্চলে পুলিসী তাণ্ডব এখনি বন্ধ করতে, সকল ঘটনা বিষয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে, আদিবাসীদের জমি দখলকারী সকল সমভূমের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করতে ও গরিবদের মধ্যে সকল কর্ষণযোগ্য পতিত জমি বিতরণ করতে।

দেবাদিদেব বলে, অন্ধ্রে নিশ্চয় ঠিক কাজ হয়েছে, কিন্তু এখানে? এখানে আমাদের কোন বক্তব্য নেই কেন?

এখন নেই, থাকবে।

এটা ঠিক হচ্ছে কি?

তুমি ত বিরাট ব্যক্তি, তুমিই না হয় একটা প্রতিবাদ-টতিবাদের ব্যবস্থা কর।

আমি?

নয় কেন?

দেবাদিদেব চুপ করে থেকেছিল। বিপুলের সঙ্গে তার যে সমঝোতা, তাতে সে কখনও সম্মুখ মঞ্চে থাকবে না। তা ছাড়া, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে নকশালদের সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রীসভার মনোভাব বা নীতি কি? তার চেয়ে অনেক জরুরী হল শ্রীযুক্তা ভারত কি ভাবছেন? তাঁর নীতি নকশালদের নির্মম নিষ্পেষণের নীতি—যা বিপুলেরও নীতি। বিপুল আজ মন্ত্রীসভার মাথায় নেই, সেটা কোন ব্যাপার নয়। রাজনীতির খেলায় পাশা ওলটাবে এবং বিপুল দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় আসবে, আসছে। না, দেবাদিদেব নিজেকে বিপন্ন করতে পারে না।

অনুপম বলেছিল, ভিয়েতনামের বিষয়ে কি ভাবছ? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে যা করছে, তাতে···

কলকাতার ছেলেদের কথা কে ভাববে?

দেবাদিদেব কথাগুলি আন্তরিক দুঃখে বলে। সত্যি বলতে কি, পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় তরুণদের হত্যাটা আর দূরের ব্যাপার থাকছিল না, কাছে আসছিল। যত যত তরুণদের চেনে এবং চেনে না দেবাদিদেব, তাদের জন্যে ভয় করছিল। তরুণরা বড়ই অবিবেচক। ওরা জানে না, চেনাজানা কোন ছেলে নিহত হয়েছে। জানলে দেবাদিদেবকে কি বিপদে ফেলা হবে? তখন ওর বিচলিত লাগবে? কিন্তু বিচলিত হতে ওর ভাল লাগে না। বিচলিত হলে দেবাদিদেবের চলে না। তাহলে ও দশটা মুখোশ পরে দশ রকম কাজ চালাতে পারে না। যেমন মাতাল হলেও ওর চলে না। সেইজন্যেই তো মাখন বা বি: ভিটামিন খেয়ে নিয়ে তবে ও মদ খায়। অনেক মদ খেয়েও মাতাল না হয়ে সকলকে অবাক করে দেয়।

ভিয়েতনামের কথা ভাবা যাবে বলে দেবাদিদেব উঠে এসেছিল। একটু তাড়াতাড়িই সেদিন ও বাড়ি ফেরে। খুব আশ্চর্য সেই তাড়াতাড়ি ফেরা। বাড়ি ফিরেই দেখে, ছেলেদের খেতে বসিয়ে দিয়ে ঈপ্সিতা বেরোচ্ছে। ঈপ্সিতা জীবনেও সন্ধ্যার পর বেরোয় না।

কি ব্যাপার?

বেরুচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ?

অশনি রায়ের কাছে।

কেন? ডি. আই. জি.র কাছে যাচ্ছ কেন?

নকুড়বাবুর ছেলেকে মেরে ফেলেছে।

নকুড়বাবু?

পার্ল ফার্মাসীর কম্পাউনডার। তোমাকে যিনি বি-নিউরন ইনজেকশান দিয়ে যান।

তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলেছে? কে?

মেরেছে তো কালকেই। সকালের কাগজেও ছিল।

সে তো কোন্ কলোনিতে...পাঁচজনকে...

নকুড়বাবু কলোনিতেই থাকেন। পাঁচজনের মধ্যে বলাইও ছিল। কেন যে বাড়ি যেতে দিলাম!

"যেতে দিলাম" মানে?

এখানেই ছিল সুমনদের সঙ্গে।

আমার বাড়িতে? অথচ আমি জানি না।

তোমাকে জানানো সম্ভব ছিল না।

কেন?

তুমি জানলে ও থাকত না।

কেন?

তোমার কানেকশানকে বলাই বিশ্বাস করত না। ফার্মাসীতেই শুচ্ছিল ক-দিন। জ্বর হয়েছিল বলে এখানে...

তুমি কি করবে গিয়ে?

বলাইয়ের বডি দিতে বলব।

তুমি বললেই শুনবে পুলিস?

দেখি। অশনি রায় আমার পিসতুতো বোনের স্বামী।

আমি যাই তোমার সঙ্গে।

না।

ঈপ্সিতা মাথা নেড়েছিল, তুমি যাবে না।

ঈপ্সিতা সে রাতে একেবারে ফেরেই নি। পরদিন অনেক বেলায় বাড়ি ফেরে। খুব সাদা ও বিপর্যস্ত চেহারা। দেবাদিদেব ফেটে পড়ত রাগে ও ভয়ে। ঈপ্সিতা সম্পূর্ণ অচেনা গলায় বলে, একেবারে চেঁচিও না। পুলিস যথেষ্ট কো-অপারেট করেছে। তোমার বাড়িতে কোন এন্‌কোয়াবিও হবে না। দাহ শুরু করে দিয়ে এলাম।

সমস্ত অভিজ্ঞতাটি অত্যন্ত তিক্ত। ঈপ্সিতা বলে, নকুড়বাবু তিন মাস আগে তোমাকে বলেছিলেন বলাইকে বাইরে পাঠাবো, সাহায্য করুন একটু?

বললেই বা কি? যে ছেলে বাপের কষ্ট বোঝে না, টেক্‌স্ টু সেন্‌সলেস্ ভায়োলেন্‌স্······

নকুড়বাবুর ধারণা, তুমি সাহায্য করলে এরকম হত না।

নকুড়বাবুর ধারণা! নকুড়বাবু কে?

বলাইয়ের বাবা।

দেবাদিদেবের মনে হয়, ঈপ্সিতার কাছে সে হেরে যাচ্ছে। মনে হতেই তার রাগ বেড়ে যায় এবং হঠাৎ, তার ঘরে টেন্‌শান ঢুকিয়ে দেবার জন্য সমগ্র নকশাল আন্দোলনের বিষয়ে মনে আসে বীতরাগ। ফলে সে মনে মনে ঠিক করে, নকশালদের বিষয়ে এতটুকু উদ্বেগও সে খরচ করবে না। উদ্যম ও মনোযোগ দেবে আরো বড় কাজে। এবং বিকেলে স্নান-টান সেরে টেলিফোন তুলতেই বোঝে কলকাতার

বাঙালী সাহিত্যসমাজও তার ভাবে ভাবিত। তরুণদের লাশ এখন খরের চৌকাঠে। অতএব বৃহত্তর ও মহত্তর ঘটনায় জড়িয়ে পড়া আবশ্যিক। ইউ-এন-আই-এস-এর সামনে ভিয়েতনাম বিষয়ক মিছিলের কথায় সবার সম্মতি মেলে ও উপযুক্ত ধুমধামে উক্ত কার্য সমাধা হয়।

জীবনের গতি বড় বেগড়বেঁয়ে। এই সময়ে পর পর কয়েকটি দ্যোতক ঘটনা ঘটে যায়। দেবাদিদেবের একদিনের পার্টির বন্ধু, কেরানী জীবন এসে হাজির হয় ও দেবাদিদেবকে চার্জ করে। আমার ছেলে বাদল পুলিসের গুলিতে উনডেড হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। তুমি এখনি চল। নইলে ওরা যত্ন নেবে না।

বাদলও নকশাল ?

নিশ্চয়। নইলে আমার এ দশা হবে কেন ?

তোমার ছেলে হয়ে সে নকশাল হল ?

তোমার মত ভাগ্য ত আমার নয়। বৌদি ছেলেদের গাইডেন্স ছিল। তোমাকে ভাবতে হল না। আমার গিন্নি যে বীরাঙ্গনা। সবই জানতেন, কিছু বলেন নি।

তুমি কি করছিলে ?

আমাকে সে বেটা পোলিটিকাল ইডিওলজি নিয়ে···চল, যাবে ত ? আমি ত করুক্কে চিনি না জানি না। তোমার নামটা মনে পড়ল।

আমি গিয়ে কি করব জীবন ?

যাবে না ?

গিয়ে কি করব বল ?

তা যাবে কেন ? পথে গিয়ে ভিয়েতনাম বিরোধী মিছিল কর গে। তাতে কাগজের ছবি বেরুবে। জীবন সামন্ত তো ফেকলু পার্টি। তার ছেলে মরুক বাঁচুক। বলি তুমি-আমি একসঙ্গে তো পার্টিও করেছি একসময়ে। তুমি খুব অমানুষ হয়ে গেছ, বুঝলে ?

চল, যাচ্ছি।

জীবন এ সময়ে অত্যন্ত ছেলেমানুষী করে। সে কেঁদে ফেলে, চোখ মুছে বলে, থাক ভাই, দয়া কত্তে হবে না।

এই দেখ, চোখ মোছ।

থাক ভাই।

দেবাদিদেব অগত্যা যায়। নকশালদের ব্যাপারটি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। প্রত্যেকের সুখী ও শান্ত গৃহকোণের চৌকাঠে তাদের রক্তাক্ত ছায়া। মধ্যবয়সীদের নৈতিক যন্ত্রণা দেবার জন্য। হাসপাতালে বাদল অত্যন্ত রুক্ষ গাম্ভীর্যে ঠোঁট এঁটে থাকে। দেবাদিদেব বলে, জীবন, এখানে ভ্যাজ-ভ্যাজ করে লাভ নেই। দেখা যাক।

কি দেখবে?

বাদলকে যাতে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

কি করবে?

দেখি, ওকে জেলেই রাখুক, তবু বেঁচে থাকে যেন।

ও বেটা মুচলেকাও দেবে না, খালাসও হবে না।

দেখি।

অদ্ভুত। বাদলের ইস্যুতে দেবাদিদেব নিজের বিবেকের কাছে পাপমুক্ত হবার চেষ্টা করে। সকল সংশ্লিষ্ট মহলে ছোটাছুটি করে। বাদল সামন্ত যদি সহযোগিতা করে, তাকে কলকাতার বাইরে সরিয়ে দিয়ে কয়েক বছর রেখে বাঁচানো যাবে—সে ব্যবস্থা করে ফেলে। জীবনকে সে খবরটি জানাতে জীবনের বাড়ি যায়। জীবনের বীরাঙ্গনা স্ত্রী এখন ছেলেকে জীবন্ত ফিরে পেতে পারেন জেনে কৃতজ্ঞতার কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং একই সঙ্গে হতাশ্বাস গলায় বলেন, ও কি শুনবে এ কথা?

ওকে শোনাবেন আপনি। এ রাজনীতি ত ভুল রাজনীতি বউদি। এ রাজনীতি করে কিছুই হচ্ছে না। মাঝ থেকে ভাল ভাল ছেলেগুলো মারা পড়ছে বই তো নয়!

স্কলারশিপ পেয়েছিল।

দেখুন, নিশ্চয় শুনবে!

বাইরে···ওর মামা থাকেন কানপুরে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ। আর···

না, টাকা দেবেন না।

দেবাদিদেব, জীবন-জায়ার গরিব মানুষের ঋণী না থাকার অহংকারে ঘা দেয় না। বাদলের ব্যবস্থা করার আত্মপ্রসাদে তার মন পাখা মেলে এবং দেবাদিদেব সানড়ে ক্লাবে উধাও হয়। সেখানে দেবকী ব্যানার্জি হুইস্কি খেতে-খেতে দেবাদিদেবের ধন্যবাদ গ্রহণ করে ও বলে, মনে হয় না, ছেলেটি কথা শুনবে। ছেলেগুলো অত্যন্ত ডেডিকেটেড তো! মনে হয় শুনবে না।

শুনবে, শুনবে।

দেবাদিদেব বলে এবং হুইস্কি খায়, কাঁকড়ার শাঁস ও শুয়োরের মাংসের মার্বেল ভাজা।

বাদলের কথা ওর মনেই থাকে না। দিন ছয়েক বাদে ও যখন দুপুরে কলেজ স্ট্রীটে বেরুবে, জীবন সামন্ত ও আরো দুজন সমান ভাগ্যহত প্রৌঢ় ঢুকে পড়ে ওর ঘরে এবং পিকাসোর ছবির প্রিন্টের নিচে উজবেকিস্থানের রঙিন কম্বলে আছড়ে পড়ে জীবন সামন্ত বলে, এ তুমি কি করলে দেবাদিদেব? তোমার প্রোপোজাল না জানালে বাদল বাঁচত। তোমার কথা তাকে বলতে সে বলেছিল, ভেবে দেখি। তারপরই সে নাকি জেল-হাসপাতাল থেকে পালাতে চেষ্টা করে। তাতেই পুলিস তাকে···পুলিস···তাকে···

কি করেছে?

মেরে ফেলেছে।

জীবন হো-হো-হো করে কাঁদে ও দেবাদিদেবকে ছেলের মৃত্যুর জন্যে অভিযুক্ত করে বারবার। দেবাদিদেবকে কোনো কথা বলতে সুযোগ দেয় না ও, এবং কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। সমগ্র

ব্যাপারটি দেবাদিদেবকে তেতো করে রেখে যায়। ঝটপট বাদলের সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক নিয়ে, "রাজু, ফিরে আয়" গল্প লিখেও সে তিক্ততা কাটে না এবং বাদলের মৃত্যুর বিষয়ে সঠিক সংবাদ আহরণ করতে গিয়ে সে যে সব কথা জানে, তাতে বেজায় ঘাবড়ে যায় ও আর খোঁচাখুঁচি করে না।

বাদলের গুলি লেগেছিল মেরুদণ্ডে। সে দাঁড়াতেই পারত না। অতএব হাসপাতাল থেকে পালাবার চেষ্টা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

বাদলকে শায়িত অবস্থাতেই জেলের হাসপাতাল থেকে সরানো হয়।

পরদিন জেলের ফটকের কাছে তার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়। আহত আসামী পালাতে চেষ্টা করেছে, এ হল পুলিসী ভার্শান। অথচ পাগলাঘন্টি বাজেনি।

বাদলের শরীরে আনৃতাবড়ি গুলি ছিল। কলারবোনে, পায়ে। নিধন উদ্দেশ্য হলে অন্যান্য জায়গায় গুলি থাকত। মৃত্যু হয় রক্তক্ষরণে।

সমগ্র অভিজ্ঞতাটি দেবাদিদেবকে বিধ্বস্ত করে রেখে যায়। পুনর্বার সে অনুপমের কাছেই ছোটে এবং অনুপম তাকে আবার বলে, অন্ধ্রের নকশালদের ওপর পুলিসী হামলা বিষয়ে পার্টি অত্যন্ত সজাগ, অতন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের বিষয়েও পার্টি অতন্দ্র হবে সময় হলে।

অনুপম ফশ করে বলে, পার্টি কি করবে তা তোমাকে জানানো সম্ভব নয়।

দেবাদিদেবের অহংবোধে তাতে ঘা লাগে। অনুপম তাহলে তাকে বিশ্বাস করে না?

আহত অহংবোধ তৃপ্ত হয় অনেক পরে। কয়েক মাস বাদে সহসা আমেরিকার বন্যপ্রাণী বিষয়ক বহুল প্রচারিত পত্রিকার ভারত প্রতিনিধি দেবাদিদেবকে আবিষ্কার করে, এবং যদিও নকশালরা বন্যপ্রাণী নয়, কলকাতাও জঙ্গল নয়, তবুও দেবাদিদেবের কাঁধে বন্দুক

রেখে সেই প্রতিনিধি হঠাৎ নকশালদের বিষয়ে প্রভূত আগ্রহ দেখাতে থাকে। শ্বেতাঙ্গটি অতীব সরল এবং দেবাদিদেবকে সে বুঝতে দেয়। নকশাল যুবকদের বাইরে, দক্ষিণপন্থী শিবিরেও বিপ্লবী কলম জেগে ওঠা প্রয়োজন। খবরটি দেবাদিদেব যথাযোগ্য স্থানে সরবরাহ করে এবং ফলে দক্ষিণতম শিবিরে সহসা তিনটি কলম বিদ্রোহী হয়। ফল পেতে তাদের দেরি করতে হয় এবং অনেক পরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হলে তবেই তিনটি কলমের পেছনের তিন জোড়া হাতে হাতকড়া পড়ে।

এ ভাবেই দেবাদিদেবের জীবন এগোতে থাকে। তারপর তাকে আবার সিংহগৌরব ফিরিয়ে দিতে মুজিবের যুদ্ধ শুরু হয়। নকশাল আন্দোলনে নীরব থাকা চলে, কেন না, তা পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক। বাংলাদেশ বিষয়ে নীরব থাকা চলে না, কেন না, তা সীমান্তের ওপারের ঘটনা। দেবাদিদেব এ সময়ে উক্ত দক্ষিণী শিবিরের নেকনজরে ফেরে এবং দরদী লেখায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর জঙ্গী পাকসেনার অত্যাচারের বিষয়টি উজ্জ্বল করে তোলে।

ফলে, সে প্রভূত অভিনন্দন পেতে থাকে এবং হঠাৎ। কি আশ্চর্য, অনুপমই তাকে বলে বসে, কলকাতার আশেপাশে এতগুলো পৈশাচিক হত্যা ঘটল, সে বিষয়ে তুমি কিছু লিখলে না। যত পৈশাচিকতা সব কি ওভার দি বর্ডার ঘটেছিল?

দেবাদিদেব যেন পেছন থেকে অতর্কিতে ছোরা খায়।

অনুপম বিচ্ছিরি ভাবে হাসে ও বলে, জানি হে, সব ঠাণ্ডা মেরে গেলে তবে তুমি লিখবে।

এ ভাবেই চলতে থাকে সব। ১৯৭২-এর ইলেকসনে বিপুল মিত্র ফিরে এলে তবে দেবাদিদেব আবার নিশ্চিন্ত ও স্থায়ী আসনে ফেরে। ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থা তার পক্ষে হয় আশীর্বাদ। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে সে লিখে চলে "শ্রাবণসন্ধ্যায়", "মনের গহনে একা", 'ঝিলমে বসন্ত" ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপন্যাস। হিংসার রাজনীতি

মানুষকে মৌল অনুভূতি ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রেম ও ভালবাসার প্রতি বিশ্বাস ফেরা দরকার। দেবাদিদেবের সৃষ্ট নরনারীরা স্থাপিত হয় সত্তর-একাত্তরের কলকাতায় এবং ভালবাসার জন্য তারা উদ্দাম আগ্রহে ছুটে যায় পালামৌয়ের জঙ্গলে, কাশ্মীরে, হিমালয়ের পাদদেশে। তিনটি বইই চিত্ররূপ পায় ও "ঝিলমে বসন্ত" হিট করে যায়। প্রাচীন প্রেম-জুটি এ ছবিতে আবার যৌথ কারবার করেন এবং প্রৌঢ়া নায়িকা প্রৌঢ় নায়ককে তাড়া করে গান গেয়ে ফেরেন পহলগাঁওয়ে।

বেশ চলতে থাকে। চলতে থাকে সব। কিন্তু হঠাৎ দেবাদিদেব এত্তেলা পায় দিল্লীতে। এমন জরুরী সে এত্তেলা যে, নিজের পয়সাতেই ও উড়োজাহাজে উঠে বসে। নিজেকে অতি বদমাস মনে হয় তার। এরোপ্লেনে চলাফেরাটা ঠিক হচ্ছে না বলে মনে হয়। একই সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিসে অবনতি ঘটছে দেখে অহেতুক রাগ হয়।

দেবাদিদেব জানতেও পারে না, এবার ওকে ঘরে ফিরতে বলা হবে। দিল্লীতে নেমেই ও ছোটে মনোজ দাভের দপ্তরে। হ্যাঁ, ওর ধারণা মিথ্যে নয়, কখনো হয় না।

মনোজ দাভে ওকে ডাইনী বুড়ির মত হু-ইশ্ করে উড়িয়ে নিয়ে যায় আরেক গোপনতরো ঘরে। সেখানে সহসা পর্দা ঠেলে ঢোকেন শ্রীমতী কুলকর্ণী। শিশিরে ধোওয়া গোলাপের মত পবিত্র ও নরম চেহারা তাঁর। গলার স্বর নরম ও মুখের চেহারা মসৃণ। বুক উদ্ধত। দেখে বোঝা যায় না ওঁর বয়েস ষাট। মুখের চামড়া ও বক্ষোদেশ ভিলাইভী প্লাস্টিক বিউটিলিশান অস্ত্রোপচারের ফলে সজীব। কমনীয়তাকে নতুন করে পাবেন বলেই পুরোনো চামড়া ও বুক দুটি উনি হারিয়ে এসেছেন বিদেশে। শ্রীমতী কুলকর্ণীর বাইরের পরিচয়, উনি সন্তোষী মার মানবী এম্বাসাডর এবং বহুজনের স্পিরিচুয়াল গাইড। ভেতরে উনি অত্যন্ত শক্তিমতী ও প্রভাবশালী মেয়েমানুষ

দেবাদিদেবকে দেখে উনি ঘুম-ঘুম চোখে হাসেন ও স্নো হোয়াইটের মত আদুরে গলায় মনোজ দাভেকে বলেন, নবপত্র, হেরাল্ড ও ভ্যালিয়েন্ট কাগজের সম্পাদকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

আজ্ঞে।

কেওয়ালের বাড়ি রেইড করার কি হল ?

কেওয়াল আজ —'র বাড়িতে ডিনার খাচ্ছেন। ডিনার শেষ হলে শেষ রাতে রেইড হবে।

ইনি ?

দেবাদিদেব বসু।

ও, ইয়েস। ওঁকে বলে দাও সব।

বলছি।

নো। আই অ্যাম টু ব্রিফ হিম।

ড্যা, প্লীজ ড্যা !

বাসু, শোন···

মিসেস কুলকর্নী কাটা-কাটা শব্দে ঝাঁকে-ঝাঁকে তপ্ত ছুঁড়তে থাকেন, বাসু ! পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার-স্যাপারে উনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এমার্জেন্সী বিষয়ে তোমাদের সমর্থন থাকা যথেষ্ট নয়, এমার্জেন্সী বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের লেখকরা অত্যন্ত সাবমিসিভ।

সাবমিসিভই তো হবার কথা ছিল। বিপুল আমাকে······

বিপুলের নাম কোরো না। বিপুল এখন ওঁর গুড-বুকে নেই। হিমালয়ান নদীতে ইলিশ চাষের ব্যাপারে বাগড়া দিতে গিয়ে বিপুল অত্যন্ত অসন্তোষের কারণ হয়েছে।

হিমালয়ের নদীতে কি ইলিশ হত ?

রাশিয়া ত সাইবেরিয়ায় ঘাস গজিয়ে দিল। ইন্স্পায়ারিং মডেল সামনে আছে, তবু তোমরা এ সব কথা বল কেন ? পিসিকাল্-চারিস্টরা বলছে বরফগলা নদীতে ইলিশ হবে। সে যাক !

কি বলছিলেন ?

এমার্জেন্সীকে ছু-হাত বাড়িয়ে অভিনন্দন জানানো এনাফ নয় বাসু। লেখকদের কাছে জাতি আত্মোৎসর্গ, প্রতিবাদ আশা করে। এত টেপাটেপি করে তিনটে বিপ্লবী কলমচি তৈরি করা গেল, তাও সেই হতভাগা কাগজের, অ্যান্ড দে আর ওপ্‌নলি অফ দ্য অপোজিট ক্যাম্প। ট্যু ব্যাড।

আমাদের ক্যাম্প কি করে এমার্জেন্সীকে গাল দেবে ?

কেন দেবে না ? এমার্জেন্সী সকলকেই সুখী করেছে তা যেমন সত্যি, তোমরা সমর্থন করছ তাও যেমন সত্যি, তেমনি এও সত্যি যে তোমার অন্তত ছু-চারজনকে, মানে বিশ্বাস করা চলে এমন ছু-চারজনকে দিয়ে এমার্জেন্সীর প্রতিবাদ করিয়ে জেলে পাঠানো উচিত ছিল। তাতে পশ্চিমবঙ্গের ইমেজ ভাল হত।

যদি জানতাম।

সত্যি বলব, তোমাদের চেয়ে অন্ধ্রের লোকরা অনেক তেজী। সেখানে লেখকরা নকশাল হয়েছে, গুলিতে মরছে, জেলে যাচ্ছে। নো নো, অন্ধ্র নিয়ে ওঁর কোনো ভাবনা নেই। অন্ধ্র ওঁর রেড-ফোর্ট। কিন্তু লেখকদের ইমেজ ওখানে অনেক ভাল। এ কি রকম কথা যে, পশ্চিমবঙ্গে একটা লেখকও নকশাল হল না, জেলে গেল না ?

সত্যি !

এর মধ্যে আমি কিছু ভাল দেখতে পাচ্ছি না। এ কথা কি সত্যি যে, নকশালরা মূর্তির মুণ্ড কাটছে ?

কিছু কিছু।

গুড, ভেরি গুড। এ সময়ে কলকাতায়, ভারতের চারশো সাতাত্তর জন সাধু-সন্ন্যাসীর মূর্তি বসানো উচিত।

চারশো সাতাত্তর জন সাধু ?

হ্যাঁ, যতবার ধ্যানে বসছি, ওই একটা মেসেজই পাচ্ছি। যাক গে, আমার কথা হল, একটা সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন করার কথা

ভাবতে হবে। তাতে এমার্জেন্সীকে সমর্থন জানাও। সেই সঙ্গেই কলকাতায় কিছু প্রতিবাদী লেখক খোঁজো।

শ্রীমতী কুলকর্নী এখন ভুবনমোহিনী হাসি হাসেন। এই বিশেষ হাসিটি ওঁর জীবনের এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। হিমালয়ে এক বরফ-ঢাকা খাদের পাশে দাঁড়িয়ে উনি এই হাসিই হাসছিলেন। জনৈক ক্যামেরাবাজ ছবি তুলছিল। হিমালয় সীমান্তে ঝটিকাসফর সেরে হেলিকপ্টারে উত্তর কাশী ফিরবার কালে মা-ভগবতী ওঁকে উক্ত হাসি-আঁটা মুখে দেখতে পান এবং তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে ওঁর পায়ে পড়ে যান। তারপরেই কুলকর্নী পত্নীর দিল্লী আগমন এবং ক্রমে ক্রমে এখন তিনি নিয়তিসমানা। যাত্রার নিয়তির মতই তিনি ঝটিকা-বেগে ভারত ভাগ্যাকাশে অদৃশ্য প্রবেশ ও প্রস্থান সেরে থাকেন। এখনো হাসতে হাসতেই উনি পর্দার আড়ালে মিলিয়ে গেলেন।

দেবাদিদেব কপালের ঘাম মুছল। এতকাল বিপুল ছিল, দেবাদিদেব নিশ্চিন্ত ছিল। এখন কে তাকে বাঁচাবে?

মনোজ দাভে বলল, তোমার আরো কাজ আছে।

কি?

মনোজ একটি নাম বলল। দেবাদিদেব বিদ্যুৎপৃষ্ট। বলল, কেন, কিছু জানো?

না। আমাকে কেউ কিছু বলে না। ডিসিশান এন্ডে আমি বা আমরা এখন নেই। আমরা কয়েকজন অমাত্য বেশ কিছুকাল শুধু পিওন বা ড্রাইভারের কাজ করছি। খবর পৌছচ্ছি। কাউকে কাউকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। নিয়ে যাবার সময়ে নিজের গাড়ি নিজে চালাচ্ছি। শোফার-চালানো বিভাগীয় গাড়ি নিচ্ছি না। এই আমার কাজ।

করছ কেন?

টিকে থাকার জন্যে। সত্যিই কি নওয়াল, নানোয়াল আর পিল্লাইকে অ্যারেস্ট করেছ?

নিশ্চয়।

ওঃ!

কি হল?

নওয়াল! পিল্লাই!

ওরা ব্যাপারটা ডেকে আনল।

তুমি নওয়ালের···

শালা। শালা, হোমফ্রন্ট এখন ন্যাপামে জ্বলছে। চল।

এ মহিলা যা-যা বললেন······

সব সত্যি হতে পারে। আবার সব পাকিয়ে তোলার পর যদি ওপর থেকে উলটো সিদ্ধান্ত আসে, তখন ইনিই বলতে পারেন, বাসুকে যা বলেছি, তা ধ্যানের ঘোরে স্বপ্নের নির্দেশে বলেছি। বলে-টলে তোমাকে-আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ইনি হিমালয়ে হেঁটে পড়তে পারেন। আমরা এখন বেপট সময়ে বাস করছি দেবাদিদেব, আমাকে কিছু বোল না।

দেবাদিদেবকে নিয়ে মনোজ দাভে হু—ইশ্ করে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেয়. এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় সহসা। কেননা সেদিন শেষ রাতে সেও হয়ে যায় মিসা। রাজধানীতে সাঙ্গ প্রায় নিশা ও সর্বাত্মক মিসা এভাবেই মিলেমিশে জয়েন্ট অ্যাকশান চালাতে থাকে।

যেখানে পৌঁছে দেয় মনোজ দাভে তাকে, সেটি ১৯১১।১২ সালের সালের বাড়ি। বিশাল বাগান। বড় বড় গাছের নৈঃশব্দ্য, যেন ঘুমিয়ে থাকা বাড়ি। বাড়িটি যাঁর দপ্তর. পৃথিবীতে তাঁর সম্বল প্রায় আপনি-ঔর-কপ্নি গোছের। সহজ ও নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্যে যিনি বিখ্যাত, তাঁকে দেখা পাবার আগে কড়া সিকিউরিটি পেরোতে হয় ঘরের পর ঘরে। দেবাদিদেবের মনে পড়ে, শিক্ষা-সংবাদ-সংস্কৃতি জগতের বহুজনকে ভ্যানিশ ও মিসা করার পর ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে আছেন। কোনো দুষ্ট লোক পেটো ঝেড়ে তাঁকেও ভ্যানিশ করে দিতে পারে।

একটি হলঘর। ঘরের দুদিকে ছাতের এদিক থেকে ওদিক উজ্জ্বল টিউব জ্বলছে। আলোর নিচে লম্বা টেবিল। টেবিলে উজ্জ্বল আলো। সুবেশা মেয়েরা সার-সার বসে পত্র-পত্রিকা উলটে যাচ্ছে। ভারতের সব পত্র-পত্রিকাই এখানে আসে। কোথায় কোন্ আপত্তিকর লেখা বেরোচ্ছে, সে বিষয়ে প্রাথমিক রিপোর্ট এই কামরা থেকেই বেরোয়। তারপর খবরটির ভিত্তিতে গোপন তদন্ত চলে। অবশেষে অবশ্যম্ভাবী মিসা। ভোররাতে হানা ও গ্রেপ্তার। দিল্লীর পথে এত সব ব্ল্যাকমারিয়া কখনো চলে নি। এত আঁটাআঁটি যাঁর নির্দেশে, শোনা যায়, তিনি স্ব-সিংহাসনে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত। এই কি নিশ্চিন্ত থাকার নমুনা এত আঁটাআঁটি, ধরপাকড় ও গুলিগোলার দরকার তারই হয়, যে সর্বদা সিংহাসন হারাই-হারাই ভয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু কেন?

কেন এই ভয়? শিল্পপতিরা খুশি, কেন না এখন তারা যে ভাবে মুনাফা লুটছে, এমনটি আগে হয় নি। ক্ষমতালোভীরা খুশি, কেন না এত ক্ষমতা তারা কখনো হাতে পায় নি। প্রশাসনে পুলিস খুশি, কেন না নিশা অবসানে এত জনকে তারা মিশায় ধরে নি। জোতদার মহাজন খুশি, কেন না খেতমজুর ও বর্গাদারদের এত শোষণ তারা আগে করে নি। উচ্চবর্ণের মানুষ অন্ধ্রে ও বিহারে খুশি. কেন না নিম্নবর্ণ ও হরিজনদের ওপর এমন অত্যাচার তারা আগে করে নি। শাসক রাজনৈতিক দল খুশি, কেন না নকশাল ও বিরোধী দলদের ওপর এমন গুণ্ডাবাজি ও হামলা তারা আগে করে নি। ১৯৭১-এ বরানগর-কাশীপুরে গণহত্যা করেও তারা বেরিয়ে গেছে সগৌরবে। দেবাদিদেবের দল খুশি, কেন না জরুরী অবস্থার মধ্যে তারা সর্বতো-কল্যাণ দেখতে পাচ্ছে। সবই তো ভাল। কর্ণধারের মনে ভয় কেন? তাঁর কাজগুলি ভয়ের সাইকোসিস প্ররোচিত। ভীষণ ভয় মানুষকে এ রকম নির্মম, নির্দয় করতে পারে। ভয়ের সঙ্গে এক্ষেত্রে আছে ক্ষমতায় টিকে থাকার অদম্য লালসা। যা হচ্ছে. তা ভালই

হচ্ছে। যে দেশ ও জাতি যে রকম, তারা তেমনি প্রশাসন পায়।

ঘরটি পেরিয়ে যেতে যেতে দেবাদিদেব সহসা এক কোণে দেখতে পায়, ওর সুপরিচিত বিখ্যাত মৃৎশিল্পী মাতঙ্গবারণ পালকে। ও চমকিত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত মাতঙ্গ পাল এখানে কি করছেন?

আপনি এখানে?

ইলিশ।

ইলিশ!

ইলিশের পোনা থেকে বাড়বাড়ন্ত অব্দি নানা চেহারা গড়ে যাচ্ছি মশাই। এটা কমিশনের কাজ।

দেবাদিদেব 'হাঁ' হয়ে যায়। হিমালয়ের বরফগলা রূপোলী জলে নদীর উৎসমুখে ইলিশ চাষের অবাস্তব ব্যাপারটি জাতির জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ, সে বিদ্যুৎ-চমকে বুঝে ফেলে। ইলিশ প্রকল্প অবাস্তব, তা বলতে গিয়েই বিপুল মিত্র গেল। বেচারা বিপুল! ইলিশকে সে শৈশব থেকে অদ্যাবধি নানা চেহারায় খেয়েছে। ওর বাড়িতেই দেবাদিদেব সর্বপ্রথম আস্ত ইলিশের রোস্ট খায়। এখন ও হাঁটতে থাকল। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল, শৈশবে ও রথের মেলা থেকে রূপোলী রঙের মাটির ইলিশ কিনত। মনে পড়ল ইলিশ প্রকল্পের আপিস ও মৎস্যবিশারদদের কলোনি করার জন্যে হিমালয়ের পাদদেশে দুটি গ্রাম ধ্বংস করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা বিকল্প জমি বলতে বিস্তীর্ণ উপলভূমি পেয়েছে। দেবাদিদেব পর্দা সরিয়ে একটি অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকল। সেক্রেটারী তাকে নিয়ে গেল খাস কামরায়, বেরিয়ে গেল দরজা টেনে। সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে ঢুকেই দেবাদিদেব দেওয়ালে কাঁচের কেসে ইলিশের পোনা থেকে বাড়বাড়ন্ত চেহারা দেখতে পেল। খোকা ইলিশ, গিন্নি ইলিশ, কর্তা ইলিশ, সবাই ভেসে চলেছে। বুদ্ধদেব বসুর ইলিশ বিষয়ক কবিতা।

যিনি বসেছিলেন সুবিশাল টেবিলের ওপারে, তিনি বৃদ্ধ, টনকো সুস্বাস্থ্যবান, ধূর্ত এবং নির্মম। টেবিলে বিশাল হরফে হুমকি, 'নো স্মোকিং প্লীজ'। বৃদ্ধের ধূমপানে আপত্তি আছে। বৃদ্ধ প্রাথমিক কথাবার্তার পর হুম করে কাজের কথায় এলেন।

দেবাদিদেব, তোমার হোমকামিং দরকার।

হোমকামিং?

স্টেজ এ হোমকামিং।

বুঝলাম না।

তোমাকে নিয়ে অসুবিধে দেখা দিচ্ছে।

কেন?

তোমার লেখায় ক্রমশ ভারতীয়ত্ব থাকছে না। না, না, দলের লোকজনের হাততালি দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আমি ভেবেছিলাম, হেমাদ্রিরাজমের মত তোমার লেখাতেও এমন কিছু থাকবে, যাতে অপর পক্ষ ঠাণ্ডা থাকে। তা হচ্ছে না দেবাদিদেব।

কেন? আমার আত্মজীবনী…

ননসেন্স হয়েছে একটা?

এ আপনি বলতে পারেন না।

আধা-সত্যে বোঝাই ওটা। সত্যি কথা কোথায় আছে ওর মধ্যে? তোমার জীবন কি একদা সংগ্রাম, পরে অবিমিশ্র সাফল্য? পরাজয়ের কথা কোথায়? কেমন যেন 'ফোনি' যাকে বলে।

'ফোনি!'

নইলে এত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়? দেখতেই পাচ্ছ, আত্মজীবনী বহু ভাষায় অনুবাদ করেও সুবিধে হয়নি। যা-যা করেছ, তাতে সুবিধে হয়নি। তোমার চেয়ে হেমাদ্রিরাজমকে নিয়ে সুবিধে ছিল বেশি।

আপনারা বলেন বটে কিন্তু আমি ওর বই বহুবার পড়তে চেষ্টা করেছি, পারিনি। এমন একটা…

আহা, মোটা দাগের লেখক ছিল। কিন্তু যা লিখত, তাতে ওর সময়ের ভারতবর্ষকে ধরা যেত। সাহিত্য নিয়ে সরকারী মাতামাতি তো ১৯৪৭ সালের পরে হয়েছে। তার কত আগে থেকে ওকে "ভারতপ্রাণ" বলা হচ্ছে বল তো?

কিন্তু আমার ভাল লাগেনি।

তোমার এই নাকতোলা ভাবটাও ক্ষতি করছে। হেমাদ্রিরাজম মোটা ধুতি পরত. কথাবার্তায় গ্রাম্যভাব ছিল, তবে লেখায় পালিশ ছিল না। কিন্তু কি সব গল্প-উপন্যাস লিখে গেছে আন্ধ্রর শবরদের নিয়ে! আমার তো মনে হয়, ওগুলো সমাজ-দলিল।

ভাষা বড় খারাপ ছিল।

তোমার দেশের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষাতেই লিখত ও। তোমার গল্পে যে ভাষা লেখ, তা জনগণের ভাষা নয় দেব।

সচেতনতার অভাব ছিল। আধুনিক জীবনের সংঘর্ষ বুঝত না। তাই চেনা জিনিস ছেড়ে শহরের কথা লিখতে গিয়েই পারেনি। তা তো হওয়া উচিত নয়? আমি গ্রাম নিয়ে লিখি, শহর নিয়ে··· সচেতন লেখক তো সবরকম জীবন নিয়েই লিখবেন?

সচেতনতা?

বৃদ্ধ ক্ষেপে গেলেন। ক্রুদ্ধ গর্জনে বললেন, সচেতনতা কি? বাজারে কেনা যায়? একটা পণ্য নাকি? তোমরাই শুধু সচেতন সাহিত্য লিখছ, আর কেউ লেখেনি? শরৎচন্দ্র পড়, প্রেমচাঁদ পড়, তারাশঙ্কর পড়, ওঁদের ভাল লেখার মত কোন্ লেখাটা তোমরা, সচেতন সাহিত্যিকরা লিখেছ শুনি? পড়, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া।

আজকের ইন্ডিয়া নয়।

তোমার মুখে ইন্ডিয়া নামটাই হাস্যকর। তোমার বিরুদ্ধে তরুণদের প্রধান সমালোচনা হল, তুমি তোমার দেশ, সমাজ ও সময় সম্পর্কে ইচ্ছে করে অর্ধ-সত্য লেখ, যা তাদের মতে, পুরো মিথ্যে লেখার চেয়েও মিথ্যাচার। তোমার বিরুদ্ধে তাদের···

আপনি শঙ্কর দয়ালের কথা বলছেন।

ভয়, ভীষণ ভয়। যে সব পত্র-পত্রিকা গোপনে ছাপা হয়, তা এঁর দপ্তরে থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। ভারত সরকারের এই সব বিভাগ, গবেষণা ও বিশ্লেষণ দপ্তর, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির অনুরূপ দপ্তর ও বিভাগের কাছাকাছি যায় নির্মমতায়, দক্ষতায়। কিন্তু তাতে দেবাদিদেবের বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকলে তা ইনি পড়বেন এবং দেবাদিদেবকে তা শুনতে হবে? ভয়, ভীষণ ভয়।

বহু শঙ্কর দয়াল আছে হে। আমি একটা কথাই বলছি। তোমার কাছে আশা করা গিয়েছিল, তুমি খুব খুলেমেলে সব সত্যি কথা বলবে। মস্ত সুযোগ পেয়েছিলে। একটা অনেস্ট আত্মজীবনী লিখলে হোমকামিং হয়ে যেত। তোমার সঙ্গে কথা ছিল, নকশাল ছেলেদের সঙ্গে মিশবে, তাদের বিশ্বাসভাজন হবে।

ওরা আমায় বিশ্বাস করে না।

তোমাকে বিশ্বাস করে না, তোমার সময়ের কোনো লেখককেই বিশ্বাস করে না। তুমি কাপুরুষ।

কেন?

মনন দত্তের নাম নেই তোমার আত্মজীবনীতে, অথচ তোমাদের পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু বছর একসঙ্গে পার্টি করেছ, একই কাগজে কাজ করেছ। ইয়েস, মনন নকশাল হয়ে যায়, অ্যান্ড হি ইজ ডেড। মৃত লোকের নাম করতেও এত ভয়? শুধু ওর নাম করলেই, ওকে ওর প্রাপ্য সম্মান দিলে কত কাজ যে হত!

বুঝিনি।

ন্যাচারেলি শঙ্কররা তোমায় ছেড়ে দেবে না। শঙ্কর যদি তোমার বিরোধী দলের লোক হয়, তাহলে ত সোনায় সোহাগা। পাঞ্চজন্য চ্যাটার্জি তো শুনেছি তোমার দলের লোক। পাঞ্চজন্য চ্যাটার্জি সেদিন লিখেছে, "কলকাতায় যখন দিনে দুঃস্বপ্ন নেমেছিল, দেবাদিদেব বসু, যাঁর কথা ছিল আমাদের পথ দেখাবার, তিনি তখন সেই রক্তাক্ত

সময়ে লিখলেন দুটি উপন্যাস—"শ্রাবণসন্ধ্যায়", "মনের গভীরে একা"। কল্পনা করা যায় না প্রবীণ লেখকের এই আত্মরতি।'

ইংরিজী একটি চালু সাপ্তাহিকের পাতা খুলে মড্ ইংরিজীতে লেখা পাঞ্চজন্যের প্রবন্ধ থেকে ঝরঝর করে পড়ে গেলেন বৃদ্ধ। দেবাদিদেবের বুকের নিচে ক্লান্তি, নিদারুণ ক্লান্তি। মানসিক ক্লান্তি, শারীরিক নয়। দেবাদিদেব নিয়মিত ভিটামিনের বড়ি, প্রোটিনেকস্ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। সারাটা জীবন এই সব ক্ষুদ্র ঈর্ষা আর ক্ষুদ্র আক্রোশের সঙ্গে বাস করতে হল। পাঞ্চজন্যকে প্রথম সুযোগ করে দেয় দেবাদিদেব। ছিপছিপে কালোকোলো ছেলেটি, খুব তুখোড় ছাত্র। একটা হতভাগা দলে ভিড়েছিল। দেবাদিদেবের চন্দ্রসভায় লেকের ধারে গীটারে ঝালা দিয়ে দিয়ে কবিতা পড়েছিল। পাঞ্চজন্যকে ডেকে এনে পত্র-পত্রিকার আপিসে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই পাঞ্চজন্য!

ও নিজেই বা কি?

তাতে তুমি ছাড় পাও না। তোমাকে বিল্ড করা হচ্ছে, তোমার ইমেজ তৈরি হচ্ছে, হোআই ডিড য়্যু হ্যাভ টু প্লে সাচ এ সেফ গেম? নো নো, হেমাদ্রিরাজম্ কেন তোমার চেয়ে, ফর হিজ ফেমাস্ ট্রিলজি এত শ্রদ্ধা পায় ভেবে দেখো।

ভয় হয়েছিল ভীষণ। কি বলতে চান বৃদ্ধ? বৃদ্ধকে বড় ভয় করে। চোখ দুটো এক্স-রে চোখ। দেবাদিদেবের মনের তলা অব্দি দেখে ফেলে। দেবাদিদেব ওঁর তৈরি। আর, যে দেবাদিদেবের মূর্তি গড়ে, সে তো ভাঙতেও পারে মূর্তি। বেদীতে তুলে ধুমধামে পুজোর পর কি অবহেলে পঞ্চাশহাজারী জরির প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন মূর্তির জন্যে বেদী শূন্য করতে হয় না? মূর্তিপূজার নিয়মই তাই। আবাহনই বিসর্জনের জন্য। দেবতাও চিরস্থায়ী থাকে না একই চেহারায়। চেহারা পালটায়, যুগোপযোগী করে।

তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাপারটা কি?

কেন ?

তোমার বউ-ছেলেরা তোমার সঙ্গে কোন জায়গায়, কোন সভাতেই যায় না কেন ?

ঈপ্সিতা ওসব পছন্দ করে না।

ওর সঙ্গে তোমার বাইরে মুখ দেখানো দরকার।

বলব ! শুনবে কিনা জানি না।

কি করে আজকাল ?

সেই লাইব্রেরিআনের চাকরি।

ছেলেরা ?

দু' ছেলে কানপুরে চাকরি করে। ছোট ছেলে পড়ছে।

কোথায় ?

সেণ্ট জেভিআর্সে।

ব্যাড।

মার কথায়। চাকরি করে, ট্যুশানি করেও ঈপ্সিতা ছেলেকে ইংরেজী স্কুল কলেজে পড়ায়।

এদিকে তুমি মাতৃভাষা নিয়ে আন্দোলন করছ ?

বাঃ, আমার ছেলে একা নাকি ? অন্যদেরও তো···

সেই তো বলছি। দিস্ হেমাদ্রিরাজম্ উড নেভার ডু। তোমরা যা-যা বল, আর যা-যা কর, দুয়ে কোন মিল থাকে না। তোমাদের ছেলেদের ঘটিবাটী বেচে ইংরেজী স্কুলে পড়াও, বিদেশে পাঠাও চাকরি করতে। দেশে যদি বা থাকে, তাকে কোম্পানি একজিকিউটিভ করতেই হবে। বাংলায় লেখাপড়া করে দেশে পচে মরার দায়দায়িত্ব সব পিপলের, কি বল ?

সত্যিই। আমরা যে কেন এ রকম হয়ে যাচ্ছি···

যাচ্ছি কেন, গিয়েছি বল।

গিয়েছি।

দ্যাট্স গুড। কিন্তু ঈপ্সিতার আপত্তি কোথায় ?

ও মনে করে আমি বরাবরই ডিজঅনেস্ট।

ব্যাড।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। নাঃ, বলবন্তের মরে যাওয়াটা বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মরেছে ছোকরা তিরিশ বছর আগে। তার ইমেজ যথেষ্ট তোলা হয়েছে। কিন্তু বাইশ বছরের একটা গল্প লিখিয়ে ছোকরার ইমেজ এত বড় করা যায় না যে হেমাদ্রিরাজমের ইমেজ ছাড়িয়ে চলে যায়।

সে ছেলেটা নাকি হি-ম্যান ছিল। এ লোকটার মত নয়। এর ড্যসিয়ের তো তিনি জানেন। বাপ-মা এসেছিল ওপার থেকে। তখন অবিশ্যি বর্ডার ছিল না; যুক্ত বঙ্গ। বাষট্টি বছর আগে কলকাতায় জন্ম—বাপ স্কুল মাস্টার—মা শৈশবে মরে যায় কলেরায় —রাণী ভবানী স্কুল—রিপনে পড়তে পড়তে 'বাংলার কৃষক' কাগজে যোগদান, জেল-মুক্তি—বিয়াল্লিশে পেটে আলসার, তেতাল্লিশ, হ্যাঁ তেতাল্লিশ সাল টুক কেয়ার অফ হিম।

কিন্তু সেদিনই কে স্মৃতিকথায় লিখে বসে আছে, জেলে গিয়ে দেবাদিদেব যাদের সঙ্গে বন্দী হয়, তারা যে শ্রেণীতেই থাকুক, নিজে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হবার জন্যে অনশন করেছিল।

মূর্খ, মূর্খ লোকটা। খারাপ নয়, তবে বেজায় বোকা, গোলমেলে। জেলে যা, প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী হ, কিন্তু চাষাভূষোর সঙ্গে জেলে যাবি তো? তারা স্মৃতিকথা লেখে না, আপত্তি ও অস্বস্তিজনক কথা মনে করে বসে থাকে না। এই হয়েছে একজাতের উইপোকা চরিত্রের লোক। যা কিছু ভাল ও শোভন বলে দেখানো হচ্ছে, তা কেটেকুটে ছারখার করাই চাই। দেবাদিদেবের সম্পর্কে অত কথা মনে করে বসে থাকার দরকার কি? মনের কথা মনেই বা রাখিস না কেন? কেন লিখতে যাস?

লোকটাও কম নয়। কামাস তো বউয়ে তোতে মিলে নশো টাকা। তাতে ধরা-করা করে, দড়ি টেনেটুনে ছুটো ছেলেকে এমন

তৈরি করলি, অবশ্য ছাত্র তারা ভাল ছিল, ব্রিলিয়ান্ট, তবু স্কলারশিপ -ফেলোশিপ পেতে-পেতে দু-ভাই ছুটল অন্য রাজ্যে। যত গরম কথা আর চরম প্রতিশ্রুতি বাইরের জন্যে। ঘর অত্যন্ত আঁটসাঁট, জীবন অতি গোছানো।

লোকটার ড্যাসিয়েরের সরকারী সংস্করণ ইচ্ছে করলে বৃদ্ধ কোন কোন প্যারায় পালটে দিতে পারেন। লাভ কি? এখন ওকে প্রয়োজন, ওকেই তৈরি করা হয়েছে, ওকেই ধরে থাকা যাক। পাঞ্চজন্য বড় উচ্ছৃঙ্খল ছেলে। নয়তো ওকে বিল্ড করা যেত।

দেবাদিদেব অস্বস্তিতে মারা যেতে থাকল। বৃদ্ধ ওর কথা ভাবছে, স্মৃতির পাতা ওলটাচ্ছে।

বৃদ্ধ চোখ তুললেন। বললেন, কেমন করে কি করবে জানি না। তবে ঈপ্সিতাকে উইন ওভার কর। কি লিখেছ শেষে?

'একার দর্পণে'।

কি সেটা?

উপন্যাস।

বিষয়বস্তু?

বড়লোক বাবার সঙ্গে ছেলের মানসিক ব্যবধান। ছেলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে যায়। বাবার মিসট্রেস ছেলের কাছে মাদার-ইমেজ হয়ে দাঁড়ায়। সেটা ফাইট করতে ছেলেটি বিয়ে করে এক নার্সকে। নার্স তার পূর্ব প্রণয়ীকে ভুলতে···বাবার মিসট্রেসের লাভারের সঙ্গে···

ব্যাড।

না না, লেখাটা···

সেইজন্যেই ডেভিড মালহোত্রা বলছিল, এমন ট্র্যাশ লিখছ, এমন সব ওয়েস্ট থেকে আমদানী-করা অস্বাভাবিক সমস্যা ভারতীয় পটভূমিতে ব্যবহার করছ যে তোমার লেখা গুরুত্ব হারাচ্ছে। এটা

তো আমার এমন ট্র্যাশ মনে হল যে মেয়েদের ম্যাগাজিনে ছাপারও অযোগ্য।

কিন্তু খুব প্রশংসা পেয়েছে।

কারা প্রশংসা করেছে? তোমার তৈরি করা দল, তোমায় যারা ব্যাক করে, তারা! দুর্ভিক্ষের সময়ে তেতাল্লিশে যা লিখেছ, সে রকম আন্তরিকতা নিয়ে একটা বড় ও মহৎ কিছু লেখ দেখি। অন্য ভাষার সাহিত্য পড়? সাউথের জেলে, উড়িষ্যার আদিবাসী-সমাজ, এই সব নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলো পড়ে দেখেছ কখনো?

না, পড়া হয়নি।

কেন পড়নি? বই পাও না?

না-না, অনুবাদগুলো পাঠায় বই কি।

তবে কি?

মানে, অন্য ভাষায় যাই লেখা হোক···

দ্যাট ক্যান নট টাচ বেঙ্গলী লিটারেচার, এই তো? অ্যাণ্ড য়ু আর রং দেব! তোমাদের বর্তমান সাহিত্যে ভারতবর্ষ, ভারতের মানুষ অনুপস্থিত। তোমার লেখায় ভারতবর্ষ কোথায়? মানুষ কোথায়? না-না, দেব, স্টেজ এ হোমকামিং। যদি পারো, তবে···

দেবাদিদেবের রক্তে ছোটাছুটি শুয়ে হয়ে গিয়েছিল। উন্মত্ত, ক্ষ্যাপা ছোটাছুটি বাঁধনহারা আনন্দে। শ্বেত রক্তকণিকা, লাল রক্তকণিকা, রক্তরস, সব হয়েছিল বর্ষায় কলকাতার দূষিত পথে-জমা জলে ঝাঁপাই-ছোঁড়া ভিখিরী বালকের দল।

তুমি পাবে, পেতে পারো।

প্রিম্যাচিওর হয়ে যাবে না?

য়ু আর সিক্সটি টু।

কিন্তু আমার তো তা মনে হয় না।

কি মনে হয়, চব্বিশে আছ?

তা নয়···

এখনো তুমি মিথ্যে কথা বলছ। বলতে চাইছ, তোমার নিজেকে বয়স মেপে প্রবীণ মনে হয় না, তরুণ মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ছোকরাদের সঙ্গে হইহল্লা করলে, কি বৃষ্টিতে ভিজতে বেরোলে কি তরুণ হওয়া যায়? হাউ য়ু ফিল শুড রিমেইন রেজিস্টার্ড ইন ইওর রাইটিং। তোমার লেখা, জীবনযাত্রা, সব তাতে বোঝা যায়, হোয়াট এ সেফ গেম য়ু প্লে। বুড়োমির লক্ষণ। গত দশ বছরে এমন দশটা লাইনও লেখনি যাতে এসে যায়।

কিন্তু……

বাধা দিও না। শুনতে শেখো। তথাকথিত লেফ্‌টিজম নিয়ে লিখে ৮লাব শিল্প করাও নিরাপদ খেলা দেবাদিদেব। হ্যাঁ খেলা। দেশ, দেশেব মানুষ যে-অবস্থায় রয়েছে, তাতে প্রতিবাদ ছাড়া সমর্থন আসে না। তাই, সেই লেফ্‌টিজমই দরকাব যাতে সাপ মরে অথচ লাঠি ভাঙে না···বিষ দিয়ে বিষ মারা. কাঁটায় কাঁটা তোলা পৃথিবীর বড় সাবেকি নিয়ম। সুতরাং সো-কল্‌ড লেফ্‌টিজম বিকাম্‌স্‌ অ্যান অ্যাবজরভিং প্যাটার্ণ, অ্যাণ্ড য়ু আর অ্যাবজর্ভড ইন ইট। লেফ্‌টিজম্‌ যা তোমাদেব আশ্রয়, তাও শেষ পর্যন্ত এস্টাব্‌লিশমেণ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে?

কি?

বৃদ্ধ খিকখিক করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, দেখছ না, তোমরাও এখন এস্টাব্‌লিশমেণ্ট? তোমরা সবাই লেফ্‌ট, জনগণের মানুষ। অথচ তোমাদের জীবনযাত্রা, জীবনযাপনের আদর্শ ও ধরণ সব এস্টাবলিশমেণ্টের পরিচারক। তোমাদের কাম্য উচ্চমধ্যবিত্তের জীবন, কোম্পানী বস্‌দের মতই তোমরা দেশের বিষয়ে চোখ বুজে থাক উটপাখির মত। তারা পার্টি দেয়, এস্কেপ খোঁজে। তোমাদের এস্কেপ সো-কল্‌ড প্রতিবাদী-সাহিত্যে। তোমাদেব সন্তানরাও কনভেণ্টে পড়ে। নয় তো ভাল স্কুলে। বিদেশে যায়, স্বদেশে ভাল চাকরি করে। সকলে তা করে না।

পারে না বলে। পার্লেই করবে। লেফ্‌ট হলে দুটো পৃথিবীর দরজাই খোলা থাকে। সর্বত্রগামী হতে পারো।

কি বলেন আপনি, ভয় করে?

না-না, ভয়? ভয়-টয় করে না। ভয়, রাগ, দুঃখ, কোন তীব্র অনুভূতি তোমাদের আর হবে না। ব্যবস্থা বড় চমৎকার! য়ু হ্যাভ বিকাম ইম্‌পর্ট্যাণ্টলি ইমপোটেণ্ট।

আপনি বড় বিটার হয়ে গেছেন।

না-না, আলোচনা করছি, আলোচনা। এভোলিউশন তত্ত্ব জানো? পমপম গান কি করে চকোলেট গান হয়ে ওঠে? তোমাদের তথাকথিত প্রতিবাদী লেখাও তাই। সাহিত্য তো অনেক হল। ফলে হল কিছু? হবে কেন? সে সাহিত্যে আছেটা কি? যে ভাষা, যে শব্দে সাহিত্য লেখা হচ্ছে, সে তো অক্ষম। হোয়াই? দ্য মাইণ্ড দ্যাট অপারেট্‌স বিহাইণ্ড, সে মনই তো অক্ষম। অক্ষমকে কার ভয় থাকে বল?

সব, সব নেগেটিভ?

নয়? মধ্যবিত্ত সাহিত্যিক, মধ্যবিত্তের নিরাপত্তা খুঁজে, মধ্যবিত্তের লেফটিজ্‌ম প্রচার করছে। কাঠের তরোয়ালে কার নাক কাটে? তোমরাও ক্রিয়েটেড, প্রোটেকটেড, নারচার্ড। একদা সং ছিলে, আজ নও। অ্যাক্‌সেপ্‌ট ইট।

সবাই তাই?

নাঃ! একটা শঙ্কর বা অমিতাভ বা সানন্দ ইজ ইকুয়াল টু অল অফ য়ু। আরো, আরো ক্ষমতাবান লেখক আছে। কিন্তু তাদের সবাই সাকসেসফ্যুলি বাইরে রাখে। তারা লিখতে পায় না, ছাপতে পায় না। তুমি নিজেকে তরুণ বল? য়ু আর ভেরি ভেরি অ্যাফ্রেইড অফ দ্য ইউথ।

এ কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। সেইজন্যেই তোমায় ভাল লাগে দেবাদিদেব

কান্ট্রি ইজ ফর দ্য···তোমার মত প্রৌঢ়, আমার মত বৃদ্ধদের জন্যে। আমাদের মত ঘাগী, কুচক্রী, লোভী, স্বার্থসন্ধী, ক্ষমতালোভী কোন ইউথ হতে পারে?

ধর্মযুদ্ধেও দেখনি ওভার দ্য ডেথ অফ থাউজেণ্ডস, প্রৌঢ় যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসে ছিল। প্রোটেস্ট যারা করে, করতে পারে, তারা কেউ ছিল না।

নতুন ব্যাখ্যা।

আহা, রাইট কজই তো জিতেছিল। রাইট কজকে জেতাতে হলে সব কিছু করা চলে। মহাভারতের শিক্ষা।

কিন্তু, যে কথা বলেছিলেন······

হ্যাঁ। পাবে, পাবে।

প্রিম্যাচিওর হবে না বলছেন?

হবে না, ব্যাখ্যা করেছি।

কিন্তু······

কি?

হোম কামিঙের ব্যাপারটা?

দ্যাট্স ফর য়ু টু জাজ।

আমার!

নিশ্চয়। পুরস্কার নিলে লোকে বলবে ব্যাটা খোলাখুলি বাজারে বসে নিজেকে বেচল।

না নিলে?

না নিলেই বা তোমার নিস্তার কোথায়? তোমায় যারা রিজেক্ট করেছে, তারা কি বলবে? পাঞ্চজন্য কি বলবে? বলবে এটাও তোমার চাল।

সহসা রক্ত চমকে উঠেছিল।

এখন আরেক রকম ছোটাছুটি চলছিল রক্তে। আনন্দে নয়, ভয়ে। হঠাৎ বৃদ্ধের অন্তর্চিন্তা এক্স-রে চোখে দেখে ফেলেছিল

দেবাদিদেব। ওঃ! কি ভীষণ, ভীষণ ষড়যন্ত্র! তাকে দেওয়া হবে পুরস্কার, তাকে নিতে হবে। নিলে পরেই তার ইমেজ ভাঙল, টপ থেকে পড়তে থাকল ও। ঘরে ফেরা আর হল না। না-নিলেও ছাড়ান-ছোড়ান নেই। এখন দেশের সকল কাগজপত্রে, বৃদ্ধের অলক্ষ্য অমোঘ নির্দেশে লেখা হতে থাকবে। যিনি সবগুলো পুরস্কার নিয়েছেন, সহসা তাঁর বিবেকোদয়ের কারণ কি?

তবে কি করবে? কি করবে ও? ঈপ্সিতার মোমের মত সাদা, লম্বাটে, রেখাজীর্ণ মুখ, সাদা চুল, ক্লান্ত চোখ মনে পড়ল। ক্লান্ত, ক্লান্ত স্বর, যা ঠিক মনে কর তাই কর। তাতে সুখ না হোক শান্তি থাকে। নিজের সঙ্গে একা মুখোমুখি হওয়া যায়।—নিজের উত্তর মনে পড়ল, উপদেশ দিচ্ছ!—ঈপ্সিতার উত্তর, না, তোমার অবশ্য তাই মনে হবে। বহুকাল ধরে তুমি কয়েকটা শব্দ দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা কর, সব কিছুর মীমাংসা কর। তুমি, তোমরা, শব্দগুলোকে ব্যবহারে-ব্যবহারে ভোঁতা, অক্ষম, পঙ্গু করে ফেলেছ। আমি উপদেশ দিইনি, সত্যি কথা বললাম। আমার অভিজ্ঞতায় যা বলে তাই বললাম!—রিঅ্যাকশনারী পেটি বুর্জোআর মত কথা বল না।—ঈপ্সিতা ক্লান্ত চোখে ওর দিকে চেয়েছিল। বলেছিল, এতবার এ কথাটা শুনেছি বত্রিশ বছরে! আমি আমার সঙ্গে একা সবসময়ে থাকি, তাই যা ঠিক মনে হয় তাই করি। কেননা আমাকে নিজের মুখোমুখি বসে সময় কাটাতে হয়। তোমার জীবনে অবশ্য ভিড় অনেক বেশি।

কি ঠিক মনে হয়? কি করবে? প্রথমে ঘরে ফেরার সংকল্প প্রচার করবে। তারপর আত্মানুসন্ধানে জনতার অরণ্যে না গিয়ে নির্জন অরণ্যে যাবে। অরণ্যটি সাজানো-গোছানো নিরাপদ হওয়া চাই। এখনো আম্‌নাটোকৃরির ভীষণ জঙ্গলের কথা মনে পড়লে ভেতর থেকে কেঁপে ওঠে সব।

বর্ষাকাল, উত্তরবঙ্গের ভীষণ, হিংস্র, বিদ্বেষী জঙ্গল। পাতা পচে

ভসভসে তরল ও আঠাল কাদা। পা ফেলছে, পা ডুবে যায়। পা তুলছে, জোঁক ধরে আছে হাঁটু থেকে গোড়ালি অব্দি। কিন্তু আমার জোঁক টেনে ছাড়াবার সময় নেই, তেভাগা চলেছে। উত্তর-বঙ্গের ভীষণ বর্ষায় মাঠে এসে জমছে লোক। যাঁর সঙ্গে যাচ্ছি তিনি একটা কথাও বলছেন না। তারপর, একসময়ে তিস্তার পাড়ে এসে দাঁড়াল। সময় নেই, যেতেই হবে। দেববাবু, জোঁক ছাড়ান। লাল্‌চে, কালো স্ফীত জোঁক পা ছাড়তে চায় না। না, আম্‌নাটোক্‌রির নির্দয় ও বিদ্বেষী জঙ্গলের কথা ভাবলে আজও ভয় করে। এখন ও সে-রকম জঙ্গলে যাবেই বা কেন? দেবাদিদেব বসু বহু পথ হেঁটেছে তেভাগার পর থেকে। গো টু কালাটোপ। চির, পাইন, ফারের জঙ্গলে গাছগুলির বিন্যাসে বড় নিশ্চিন্ত সমতা, পাহাড় ও মাটি মোটামুটি পরিষ্কার। আকাশভরা তারার মত ডেইজি ফুলের রেণু ছাড়া আর কিছু ওর অধুনা মূল্যবান পায়ে জড়াবে না।

জঙ্গলে থাকবে, আত্মানুসন্ধান করবে, তারপর ঘরে ফিরবে। হ্যাঁ, সব করবে ও, সব স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সই করবে. বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দেবে। তরুণরা আবার তাকে বিশ্বাস করুক। ইদানিং ওদের চোখে বড় ডিসমিস-অর্ডার থাকে। জনসভায় ওরা বড় প্রশ্ন করে, টিটকিরির চিৎকার দিয়ে ওকে বসিয়ে দেয়। এত বিশ্বাস হারাবার মত কি করেছে ও? ওরা কি জানে, ও কে? ইমেজ বড্ড নষ্ট হয়ে গেছে? তরুণরা তো ওই পারে, মূর্তি ভাঙতে, টেনে নামাতে। হায়! নির্বোধ তরুণরা জানে না, মূর্তি রাখার পীঠিকা কখনো শূন্য থাকতে পারে না। পাথরে বা ব্রোনজে তৈরি বৃটিশ ভাইসরয়ের মূর্তি তো নয় যে শূন্য বেদী রাস্তার পাশে করুণ ক্ষমাপ্রার্থনা করে চলবে? জনমানসে মূর্তি তৈরি করে রাখতে হয়, ওর মূর্তি। ওকে সরিয়ে দিলে নৈরাজ্য, অসিপত্রবন নরক। সে অন্ধকারে পথ ফুল ফুটিয়ে রাখে না। হাঁটতে গেলে যে হাঁটবে, অসিফলকের মত তীক্ষ্ণ পাতা তাকে রক্তাক্ত করবে। রক্তোৎসব

তো অনেক হল, তরুণরা বোঝে না কেন? ঘরে ফিরবে দেবাদিদেব।

সব কথাই ঈপ্সিতাকে বলেছিল। দিল্লী থেকে কলকাতা গিয়েছিল। ঈপ্সিতা বলেছিল, ঘরে ফিরবে? ইমেজ ফেরাবে? ঘর তো তুমি আজকে ছাড়নি?

কবে ছেড়েছি?

নিজের মনকে শুধোও। শুধোবে বলেই তো জঙ্গলে যাচ্ছ।

কিন্তু—

হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তোমাকে সাহায্য করব বইকি। আমি তো বত্রিশ বছর ধরেই রাজী আছি, অপেক্ষা করে আছি। তোমার প্রয়োজনে একবারও লাগব, এ ছাড়া আমার জীবনে চাইবার কি আছে বল?

দেবাদিদেব বসু চোখ তুলে দেখেছিল, বাহান্ন বছরের ঈপ্সিতা ওকে বিদ্রূপ করল কি না।

না, বিদ্রূপ করছি না।

ঈপ্সিতা ওর স্বগতচিন্তা বুঝে বলেছিল। তারপর বলেছিল, সাত বছরের মধ্যে তিনজন জন্মাল ওরা। তারপর থেকেই আমাকে তোমার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু কোনদিন প্রয়োজন হবে বলেই তো তুমি আমাকে তাকে তুলে রেখেছিলে?

তুমি অশোকের কথা ভুলতে পারনি না?

না। ভোলার কথা ছিল?

দেবাদিদেব কথা বলেনি। অশোক। ডাক্তার। ওর অনুরাগী। বিয়েতে প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী। দেবাদিদেবের গ্ল্যামার, জলুস অশোকের ছিল না। কিন্তু দেবাদিদেব এসে পড়ে ঈপ্সিতার বাবাকে চোখ ধাঁধিয়ে না দিলে হয়তো ঈপ্সিতা · কিন্তু দেবাদিদেব জানে, ও অশোকের চোখ দেখেছিল। সে-চোখে নীরব ভালবাসা থাকত। সহিষ্ণু, কোমল, গভীর চোখ। যা অন্যে ভালবাসে তা কেড়ে নেবার

দুর্দম লোভ, হিংস্র, জেদ, দেবাদিদেব কোনদিন অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু প্রথম ছেলে জন্মাবার বছর খানেক বাদেই অশোক ওদের জীবন থেকে সরে যায়। এখন কোথায় আছে? কোথায় থাকে? পার্টির ডাক্তার ছিল একসময়ে। এখন অশোক বিশ্বাসের নামও কেউ করে না। এত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কি ভালবাসা থাকে, না স্মৃতি, শুধু স্মৃতি? স্মৃতি তুমি বেদনার। আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান। অশোকের গলায় গান, কবিতা।

তুমি চিরদিন মধু পবনে
চির বিকশিত বন ভবনে
যেও মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি?
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো॥

ঈপ্সিতা নিয়তির মত সর্বজ্ঞ চোখ তুলে বলেছিল, আমি তো শুধু স্মৃতি নিয়ে বাস করি নিজের সঙ্গে একা। অশোকের কথা ভাবি বই কি।

আমি তো বলিনি ভুলে যাও। কিন্তু তোমার কথা বল।

কি বলব?

যদি সত্যিই ঘরে ফিরতে পারি, আমারও জীবনের সার্থকতা হয় একটা। সবটা অপচয় বলে মনে হয় না।

অপচয় মনে হয়?

হয় বই কি!

খুব ভয় হয় দেবাদিদেবের। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যাচ্ছে কেন? না-না, ও কাম ব্যাক করবে। ফেরার পথে সব নিশ্চয়

কাঁটা নয়। কাঁটার মাঝে মাঝে পথের রেখা নিশ্চয় আছে। হ্যাঁ, খোঁচা খেয়ে রক্তারক্তি হয়েই ফিরবে।

প্রেসনোট বেরিয়েছিল একটা। দেবাদিদেব বসু, প্রখ্যাত, আন্তর্ভারতীয়, বিদেশে খ্যাতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক আত্মানুসন্ধানের জন্য নির্জন বাসে যাচ্ছেন। তাঁর লেখা বহুদিন ধরেই জীবন মানুষ ও সমাজ বিমুখ হয়ে গিয়েছে। কেন হয়েছে, তা জানবার জন্যেই তাঁর এই স্বেচ্ছা নির্বাসন।

আসার আগে ঈপ্সিতাই থার্ডক্লাস স্লীপারের টিকিট করে দেয়। হঠাৎ কাছে এসে ওর বুকে হাত রেখে বলে, ঘর ছেড়ে বাইরে তুমি অনেকদিনই পা বাড়িয়েছ।

সেই 'এককালে', যখনকার ভূমিকার জন্যে তুমি 'তুমি' হয়েছ, তখনও তুমি সম্পূর্ণ সৎ ছিলে না। বাধা দিও না, আত্মানুসন্ধান করতে যাচ্ছ, বুকের নিচে তন্ন-তন্ন করে খোঁজ, দেখ কবে থেকে স্খলন শুরু হয়েছিল। বি অনেস্ট। তার চেয়ে বড় আর কিছুই নয়, কোনদিন না।

করব ঈপ্সিতা, করব।

ফিরে এলে দেখবে আমি ঠিকই আছি। আমাকেও, মরব তো একদিন, তোমার ওপর শ্রদ্ধা নিয়ে মরতে দাও।

ঈপ্সিতা অনেকদিন এত কথা একসঙ্গে বলে না। দেবাদিদেবের ভেতরে কি যেন ফেটেছিল। ভেঙেছিল, গলে নেমেছিল।

যদি আমাকে ওরা···দেয়?

ফিরিয়ে দিও। তোমার বইয়ের রোজগার আছে। দু' ছেলে কাজ করে টাকা পাঠায়। আমি চাকরি করছি, সুমনও কাজ পেয়ে যাবে পড়া শেষ করলেই।

কিন্তু···

ফিরিয়ে দিও।

মেয়েরা শেষ অবধি মেয়েই থেকে যায়। ঈপ্সিতাকে দেবাদিদেব

কি করে বোঝাত কমিটিতে থাকুক বা না থাকুক, এখানে থাকুক বা বিদেশে, সে-ই বৃদ্ধের নির্বাচিত পুরুষ। সকল আয়ুধ তারই, সকল শক্তিও তার। বীরুর মত সে গলার বাঁ পাশের প্রধান রক্তবাহ ধমনী কেটে মস্তিষ্কে ধাক্কা মেরে মানুষ মারে না, মারেনি। বর্বরতায় ওর চিরকাল ঘেন্না। কিন্তু দেবাদিদেব হয়ে প্রকাশ রায়, সানন্দ মিত্র, পলাশ সরকার, নরসিংহম পিল্লাই, শঙ্কর দয়াল, অমিতাভ দাভে, বহুজনকে সংহার করেছে। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তারা আউট। সশরীরে বর্তমান বটে, আবার অনুপস্থিতও বটে। শুধু শরীরী উপস্থিতিতে তো লোক উপস্থিত থাকে না।

শিব হয়ে সংহার করেছে। ব্রহ্মা হয়ে বিষ্ণু হয়ে সৃজন ও সযত্ন পালন করেছে। দিলীপ চন্দ্ ভাস্কর, মনীষী সেন, অরুণিম দাশ, কেকয় কোহেনকে। আরো কতজনকে। সৈন্যবাহিনী একটা। হাতিয়ারে সাজিয়ে দিয়েছে। তারা এখন সর্বশক্তিমান। একটা তরুণ লেখকদের জেনারেশন তৈরি করছে। পাঞ্চজন্য চ্যাটার্জিটা বেইমান, দল ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মেয়েরা মেয়েই থেকে যায়। ঈপ্সিতা কি করে বুঝবে, যাদের বাঁচতে দিয়েছে, তাদের মদমত্ততা দেখলে ওর যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ হয় যাদের বাঁচার সম্ভাবনা নষ্ট করে বাতিল করে দিয়েছে, তাদের চোখে পরাজয় ও হতাশা দেখলে? সানন্দ, নরসিংহম্, অমিতাভ,—এরা অশরীরী অনুপস্থিতির মত কাজকর্ম-লেখা-প্রকাশনা-আত্মপ্রকাশের রক্তমাংসযুক্ত শরীরী জগতের বাইরে। ওরাও তরুণ, বয়সে তরুণ। ওদের বাতিল করে দিতে পেরেছে, এ আনন্দ ওর রক্তকে নাচিয়ে তোলে, নাচিয়ে রাখে।

কিন্তু সব ভুলতে হবে। ঘরে ফিরতে হবে। ডাইরেকটিভ। অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে ওকে। বৃদ্ধের চেয়ারে একদিন ও বসবে। টেলিফোনে, ওয়্যারলেসে নিয়ন্ত্রণ করবে সমস্ত দেশের চিন্তাজগৎ। মানুষ, জনগণ, মহামূর্খ। কে অনুবাদ করেছিল

হাইনের কবিতা ? জনগণ নামে এক বিরাট পশু আছে······। জনগণকে যা বোঝাবে, তাই বুঝবে। ছাপার অক্ষরে যা দেখবে, তা পাঠ্য হোক বা সাহিত্য, খবরের কাগজ অথবা পোস্টার, তাতেই ও থাকবে। তখন ও যা চাইবে দেশ তাই করবে। ভাবলেও রক্তে বিপ্লব সংগীত শুরু হয়ে যায়। মহীন তলাপাত্র 'ইণ্টারন্যাশন্যাল' বড় ভাল গাইত, এমনটি আর শুনল না। বৃদ্ধই কি সব বোঝে ? ইমেজ! অত সহজে যদি ইমেজ নষ্ট হবার হত, তাহলে আর সত্তরে-একাত্তরে-বাহাত্তরে দেবাদিদেব 'সীমান্তের ওপারে রক্ত', 'অরুণাংশু, ঘুমিয়েছ ?' 'প্রিয়তমাসু' লিখেও টিকে থাকত কি ? এসব লিখবে বলেই দিলীপ, মনীষী, অরুণিম, কেকয়দের তৈরি করা ছিল। তারাই তো সব নিন্দা ও সমালোচনার মুখে 'আমাদের একমাত্র আশা' কথাটা ছুড়ে মেরেছিল। তাদের লেখা যেহেতু লক্ষ লক্ষ জনগণ পড়ে, সেহেতু 'আমাদের একমাত্র আশা' কথাটা একটা আন্দোলনে দাঁড়ায়, আন্দোলন থেকে কাল্ট্, কাল্ট্ থেকে অকাট্য সত্যে। ওর বিপক্ষ সমালোচকদের ক্ষমতা সীমিত, দুর্বল, 'আমাদের একমাত্র আশা' কথাটা ওদের মুখের ওপর নাপাম হয়ে ফেটে পড়ে। নাপাম খেয়েও বেঁচে আছে, এমনটি কে কোথায় দেখেছ ?

ঈপ্সিতাকে দেবাদিদেব কথা দেয়, জীবনের উৎসে ফিরে গিয়ে আত্মানুসন্ধান করবে। বুকের নিচে নেমে যাবে। ঈপ্সিতা, ঈপ্সিতার প্রিয় কবিতার সোনালী ডানার চিল, ও ধানসিঁড়ি নদী, ঈপ্সিতা 'তুমি অনেস্ট হও' বলে ওকে ঘিরে-ঘুরে কাঁদছে ! ও পলাতক নয়, নয় রোমান্টিক, তাই বলবে না 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে'। ও চ্যালেঞ্জ স্বীকার করবে। ঈপ্সিতা মিথ্যে কথা বলেছে। ওর অসততা, ঘর ছেড়ে বেরুনো সেই উজ্জ্বল অতীতে শুরু হয়নি, হতে পারে না। ওকে হৃদয়ানুসন্ধান করতেই হবে। শুধু ঈপ্সিতার জন্য নয়। যদিও ঈপ্সিতা ও ওর মধ্যের ব্যবধান এখন ঘুচে গেলেই ভাল। বয়স হলে মানুষ স্ত্রীর কাছে, পুরনো সম্পর্কের আশ্রয়ে

ফিরে এসে আরাম পেতে চায়। ঈপ্সিতা যেন ওআর্নিং দিল। 'সম্পূর্ণ অনেস্ট হও' বলল, 'না হলে চলে যাব' বলল না, উহ্য রাখল। কিন্তু হুমকিটা আছে। আপোলিটিকাল মেয়ে! কি আর করবে, হয়তো ছেলেদের কাছে যাবে, নয়তো ওর বাবার কাছে দেওঘরের বাড়িতে। কিন্তু ঈপ্সিতাকেও ও দেখিয়ে দেবে।

এই সবকিছুই কালাটোপে আসার আগে ঘটে যায়। তারপর কালাটোপ। একা, একেবারে একা। গাছপালা, বন, ফুল, আকাশ, পাহাড় কি অস্বস্তিকর। কি অসহ্য রাতের এই সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ্য। ঘর, আলো, মানুষ, অনেক স্কচ, অনেক সিগারেট, অনেক বাতাসহীন বন্ধ শার্সি-আঁটা ঘর, মুখের ওপর ফ্ল্যাশ জ্বলবার আনন্দ, স্তাবকদের স্তুতি. বৃদ্ধের অতন্দ্র চোখের পাহারায় সুরক্ষিত থেকে তরোয়াল ঘোরাবার আনন্দ। এই তো জীবন। অসহ, অসহ আজ মিছিলে বাঁধা মূঢ় জনগণের মধ্যবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষী-মজুর মুখ। ছেলেরাও সুদূরের স্মৃতি। কি যে নিশ্চিন্দি! বৃদ্ধ আছে বলে দেবাদিদেব ছোট খোকাটির মত দুষ্টু আর মিষ্টি হয়ে কলিন্সের তাম্বুরিন শুনতে পারে। কিন্তু কাল থেকে হৃদয়ানুসন্ধান করতে হবে। নইলে চার-চারটে দিন এখানে থাকবে কি করে?

রাতে চৌকিদার খানা নিয়ে এল। রুটি, উরুদ ডাল, গুচ্ছির তরকারি। ওর সঙ্গে কথা বলা যাক। জনগণ-সংযোগ।

এটা কিসের সবজি?

গুচ্ছির।

গুচ্ছি কি?

দেওদার গাছের গোড়ায় বজ্র-বিদ্যুতে বৃষ্টি হলে একরকম ছাতা জন্মায়। তাই হল গুচ্ছি। খুব দামি জিনিস। শত-শত টাকা কিলোয় য়ুরোপে বিক্রি হয়। হিমাচল প্রদেশ আর পাঞ্জাবের লোক খুব ভালবাসে।

কত মাইনে পাও?

কত আর।

কদ্দিন কাজ করছ?

দশ বছর।

সুখে আছ?

হ্যাঁ সাব। ঘরে জমি কিনেছি। মোষ কিনেছি একটা।

মনে সুখ পেয়েছ?

চৌকিদার হাসল, উত্তর দিল না।

বাড়িতে কে কে আছে?

ঘরওয়ালী, ছেলেরা, বাবা, জেঠা।

ঘরওয়ালী কে?

বউ।

এই মাইনেতে চলে সকলের?

চলে যায়।

কথাবার্তা আর এগোয়নি। দেবাদিদেব ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে সিগারেট খেয়ে। কাচের জানালার ওপাশে তারা। বাবা বলত, তোর মা তারা হয়ে চেয়ে আছে। দেবাদিদেব তখনি জানত, বাবা মিথ্যে কথা বলল। বিজ্ঞান পড়ে ও জেনেছিল, তারাদের আলো পৃথিবীর মানুষের চোখে যখন পড়ে, তার মধ্যে বহু আলোকবর্ষ কেটে যায়। বহু তারা সরে যায়। মানুষ মনে করে তারা বেঁচে আছে। মার পক্ষে আকাশে তারা হয়ে ফুটে থাকা সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে ও ডেইজি ফুল ঢাকা পাহাড়ে উঠেছিল।

তিন

বাংলো থেকে বেরোলে পাহাড় কাছেই। পথটুকু ছায়া ঘন, হিম-হিম। বড় বড় বনস্পতি পরপর দাঁড়িয়ে। পাহাড়টি খুব উঁচু নয়। নিচের দিকে কিছু গাছপালা পেল দেবাদিদেব, ওপরে গিয়ে পেল না। সামান্য আন্দোলিত নাভি-উচ্চ পাহাড়, সবুজ ঘাসে

ঢাকা, তারার মতো ডেইজি ফুল শুভ্র হাসি বিছিয়ে রেখেছে। ডেইজি ফুল দেবাদিদেব কখনো দেখেনি আগে। ছোটবেলা ইংরিজী কবিতায় পড়েছে ফুলটির নাম। ভারতে ডেইজি ফোটে বলেই জানত না। পাহাড়ে অনেক ফুল দেখেছে আগে-আগে। পরে ফুলের ছবি আঁকা বই দেখে বুঝেছে, ওগুলোই হল ছোটবেলা থেকে পড়ে-আসা বাটারকাপ, আজেলিয়া। ডেইজি দেখেই ও মনে মনে নাম দিল "তারা ফুল"। বিদেশী নাম-টাম ওর পছন্দ নয়, বিদেশী কিছুই।

চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বরফঢাকা পাহাড় দেখতে কৌশানী যেও না, কোথাও যেও না, ডালহৌসী এসো। দেখে দেখে ক্লান্তি আসছে দেবাদিদেবের। ক্লান্ত, ক্লান্ত সে। পাহাড়ে-বরফে-নীল আকাশে-সাদা মেঘে-উন্নত দেওদার বনে-পাহাড়ীয়া আদিবাসী শিশুদের নীল চোখে। আমারে ফিরায়ে লহ জনারণ্যে। দাও ফিরে সেই সব বহু মানুষ ঘিরে থাকা সন্ধ্যা, কাচ-আঁটা জানলা, ধোঁয়ায় বাতাস ভারি ঘর। হুইস্কির ওপর ভেসে-থাকা বরফ দেখলেই যথেষ্ট বরফ দেখা হয়। আকাশ-টাকাশ না দেখলেও চলে। অত প্রকৃতি-তদ্গত-চিত্ত হবার দরকার কি? প্রকৃতি কি মানুষের জন্যে কেয়ার করে? সব মানুষ মরে যাক, তখনো চাঁদ এবং সূর্য উঠবে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য ওঠা, জয়সলমীরের মরুভূমি বা অন্যত্র সমুদ্রে সূর্যাস্ত, বন-পাখি-প্রজাপতি-ফুল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ঝুট-ঝামেলা থেকে যাবে একই রকম। প্রকৃতি মানুষ ব্যতিরেকে চলে, মানুষ প্রকৃতিকে নিজের দলে খেলতে নেবার জন্যে বোকার মত ব্যস্ত কেন? চিত হয়ে শুয়ে পড়ল দেবাদিদেব, চোখে হাত ঢাকা দিল। চৌকিদার বলেছে, এই ঘাসে কোনো পোকা-টোকা নেই।

বড় ভারি ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে। বহুদিন এত বেশি খায়নি সকালে। চমৎকার নরম হাত-রুটি, মধু, মাখন, ডিমসিদ্ধ, দুধ,

ক্রীম, পরিজ, কফি। বহুকাল যাবৎ সকালে ছোটাহাজারি-টাজারি খাওয়া অভ্যেস নেই। ব্রেকফাস্ট খেতে ইদানিং ইচ্ছে হয় না। দেবাদিদেবের সকালই হয় দশটা সাড়ে দশটায়। আসলে মদের সেশানটাই ওদের শুরু হয় রাত নটা নাগাদ। চলে, চলে, চলতে থাকে। যেখানেই সেশান হোক, কেউই ঢোকে না খালি হাতে। বগলে বোতল নিয়েই ঢোকে। মদের সঙ্গে টুকুটুকুর ব্যবস্থা করে যার বাড়িতে সেশান, সে। যেহেতু সে সব লোক শাঁসালো মক্কেল—স্টীভেডোর আর্মির কন্ট্রাকটর নামকরা গাইনি—সিনেমা হলের মালিক—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—সেহেতু টুকুটুকু হয় জমপেশ। কাঁকড়ার শাঁস, ক্যাভিয়ের, সসেজ, বীফ টিকিয়া, চিকেনের খুদে রোল। স্টীভেডোর পত্নী হাজার রকম মাছের ভুজিভাজা করতে পারেন। ওদের বাড়িতেই দেবাদিদেব খেয়েছিল অতীব সুস্বাদু ইলিশ মাছের পকৌড়া, চিংড়ি মাছ বেটে ধনে পাতা দিয়ে বড়া। ভেটকি মাছের যে রোল করেন মহিলা, তা দিয়ে দেবাদিদেব পুরো ডিনার খেতে পারে। সেখানেই, মানে যেখানে মদ খায় দেবাদিদেব, সেখানেই যা পারে খেয়ে নেয়। মদ খাবার সময়েই, প্রচুর মাখন সহ। ফলে মদ ওকে মাতাল করে না, স্টমাক পায় প্রোটেকশন। সেশান শেষ হলে দেবাদিদেবের ঘরে ফিরতে রাত একটা-দুটো-আড়াইটে। ঘুম আসতে আসতে ভোর। তারপর ও যখন ওঠে, তখন কফি ছাড়া আর কিছু খাবার কথা মনে করতে গা ঘোলায়। সে সময়ে এমন কাণ্ড হতভাগা কলকাতার, দেবাদিদেবকেও প্রাণের ভয়ে প্রোটেকশান নিতে হয়েছে। উগ্রপন্থীদের কাজকারবারও হটচটকা। নকশালদের ভুলে থেকে বাংলাদেশ নিয়ে হেদোবার জন্যে. কি আশ্চর্য, ওর বাড়িতেই এল টেলিফোন। কি সর্বনেশে প্রথম সংলাপ!—আপনাকে কেন মারা হবে না বলতে পারেন? —না না, তাদের ফোন নয়। দেবাদিদেব তো সর্বত্র বিরাজমান টোমাটো। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে। তাদেরও বন্ধু দেবাদিদেব। তাই নয়? সে ফোনটা নিশ্চয় কোনো

হতভাগা হিংস্থটের। যা হোক, এ বয়সে এ হেন ফোন পেলে সাবধান হতেই হয়। দেবকী ব্যানার্জিকে সেই কারণেই বলা। দেবকী ব্যানার্জি কে-কি-কেন-কবে-কোথায়—তা দেবাদিদেব ভালই জানত। কিন্তু নিত্যি যদি একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়, সে লোকটি যদি তোমার আনাগোনার প্রতিটি সেশানে ঢোকে বগলে হুইস্কি নিয়ে ইয়েভতুশেংকোর কবিতা বলতে বলতে, সেশানে যতক্ষণ থাকে, উচ্ছসিত গলায় নকশাল ছেলেদের লেখা কবিতা বলে যায়—সেই পশ্চিমবঙ্গে এ. এ. ই=অ্যাপ্রিহেন্‌শান অ্যান্‌ড এলিমিনেশন—এস. এ. ডি.=সার্চ অ্যান্‌ড ডেসট্রয়—ইত্যাদি প্রয়োজনায় ঝামেলার ভারপ্রাপ্ত স্থপতি, সে ধারণা চলে যায় মনের পিছনে। তাকেই মনে হয় নির্ভরযোগ্য। এবং তাকেই বলে ফেল তুমি ফোন-মেসেজের কথা—ফলে সে পরদিন তোমার মোদো ঘুম ভাঙিয়ে বলে, ভোরে উঠবে, ভোরে উঠবে দেব। আমি কাল রাত একটা অব্দি মাল খেয়েছি, কিন্তু আজ পাঁচটায় উঠেছি। কাঁচা ছোলা খেয়েছি, যৌগিক ব্যায়াম করেছি, আমার বন্ধু ও বিশ্বস্ত প্রহরী রোভারকে, মানে আমার অ্যালশেসিয়ানকে নিয়ে লেকে ছুট করিয়েছি, বাড়ি ফিরেছি, এখন বাজে ছ-টা দশ। শোন, ফোনটা পাবলিক বুথ থেকে করা হয়েছিল। তাতেই ট্রেস্ করা গেল না। তোমাকে প্রোটেকশান দেওয়া হল। দুজন লোক রাতে তোমার সঙ্গে থাকবে, ফলো করবে। না না, কোনো আপত্তি নয়। তুমি একটা দামী লোক! তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগলে বিপুল আমায় আস্ত রাখবে?

দেবাদিদেব কি বিপদে পড়ে দুই মক্কেলকে নিয়ে। চেহারায় খোঁচড় মাখানো। দেখলেই চড় মারতে ইচ্ছে হয়। সে ইচ্ছেও ডেঞ্জারাস। যেহেতু অফিসিয়ালি দেশের কোথাও ভায়োলেন্‌স নেই—যেহেতু "ভায়োলেন্‌স" শব্দটি নকশালরাই জানাল, সেহেতু এইসব মাগুর মাছ খেকো, আমাশাতাড়িত খোঁচড়রা অহিংস উপায়ে দমাদম্

গুলি চালায় মানুষ-টার্গেট পেলেই। দুদিন যেতে না যেতেই দেবাদিদেব দেবকী ব্যানার্জিকে বলে, আমার ঘাড় থেকে ওদের নামান।

বাড়িতে পুলিশ দেব ?

না না, কিচ্ছু চাই না।

দেখছি।

'দেখছি' বলেই দেবকী দিল্লীতে উড়ে গিয়েছিল নকশাল-বিষয়ক গোপন সম্মেলনে এবং উক্ত কারণে খোঁচড়দ্বয় আরো কিছুদিন দেবাদিদেবের পেছনে লেগে থাকে দুষ্ট এঁটুলির মত। দেবকী দিল্লী থেকেই যায় হরিদ্বারে শ্রীশ্রীপরমপিতা দেবর্ষির জন্মোৎসবে এবং খচড়াই করে, দেবর্ষির প্রসাদ এনে দেয় দেবাদিদেবকে। প্রসাদটি খাবার নয়, দুবার শোঁকায়। এক শোঁকায় আধা খাওয়া। দুই শোঁকায় পুরো খাওয়া। দুবার প্যাঁড়া শোঁকার পর দেবকী সেই প্যাঁড়াটি দিয়ে কাকভোজন করায় এবং বলে, ঠিক আছে।

এত কাণ্ড করে তবে সে প্রোটেকশানদের ঘাড় থেকে নামানো যায়। কিন্তু কলকাতা অতীব খচড়াই জায়গা। ঈপ্সিতার এক অতি দূর সম্পর্কের মাসতুত বোন সুন্দরী ইভা, বগলে তার স্পানিস কুকুর নিয়ে দেবাদিদেবের বাড়ি বয়ে এসে বলে যায়, হাউ ফানি [illegible] দেব দা নাকি পুলিস পাহারায় ঘুরছ ? শুনে তো হেসে বাঁচি [illegible] কারণটাও বেজায় মজার। তুমি করেছ কি যে, নকশালরা [illegible] মারবে ? তোমার বই তো পড়ি আমরা। মেয়েছেলে[illegible] বইয়ের পাঠক, তাদের লেখায় নকশালদের কি এল-গেল ! [illegible]

যারা সুন্দরী মেয়ে নয়, যাদের স্পানিস কুকুর নেই, [illegible] ও মাথায় আব আছে, এহেন লোকরাও কথাটি বলে যায় এবং [illegible] একদিন এ কথা শুনে স্বভাবসিদ্ধ হ্যা-হ্যা হেসে বলে, এ [illegible]থাটা হচ্ছে এ দশকের সবচেয়ে রগুড়ে ব্যাপার।

দেবাদিদেব বোঝে এখন দৃশ্যপট থেকে সরে থাকাই ভালো এবং সে ঝটিতি উড়ে চলে যায় কোনো পরিচিত বিদেশে, বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে। সে ফিরতে ফিরতে কলকাতায় বহু নামী ও দামী মাথা ধড় ত্যাগ করে, ফলে তার কথা সবাই ভুলে যায়। প্রোটেকশান নেবার কথা।

একসময়ে প্রোটেকশানে ঘোরাফেরার কথাটা হতভাগা পাঞ্চজন্য আজকাল খুব বলছে চারদিকে। হতভাগা। ওই সময়ে যদি খচড়াই করত পাঞ্চজন্য তো ওকে দেবাদিদেব মিসায় ভ্যানিশ করিয়ে দিত। সেদিন আর নাই রে দাদা, সেদিন আর নাই। সেই মিসা, সেই জরুরী অবস্থা, সবই আছে। কিন্তু পাঞ্চজন্য এখন সর্বশক্তিমান বৃদ্ধের ভাল খাতায় বিরাজ করছে। বৃদ্ধ কেন যেন পাঞ্চজন্য শাঁখে পোঁ বাজাতে আগ্রহী। এও উক্ত বিশ্বশিশুর বিরাট এক খেলা। দেবাদিদেবই প্রায়োরিটি। কিন্তু কোন কারণে সে ফেইল করলে পাঞ্চজন্যকে তোলা হবে। মদতটি আছে জেনেই পাঞ্চজন্য হঠাৎ দোদমা মার্কা লেখা লিখছে। এমার্জেন্সী চলছে চলবে। এমার্জেন্সীর বিরুদ্ধে লিখলে নয়জনকে মিসা করা হবে। একজনকে ছেড়ে রাখা হবে। তাতে প্রমাণ হবে, এমার্জেন্সী অন্যান্য কারণে জাহির হয়েছে। তাতে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়নি। প্রমাণ, পাঞ্চজন্য জেলে নেই, বাইরে আছে। পাঞ্চজন্যের উদ্দেশ্য সবচেয়ে বেশি সিদ্ধ হবে, যদি তাকে মিসা করা হয়। দেবাদিদেব জানে, পাঞ্চজন্যকে মিসা করলে, জেলে তাকে রাখা হবে সাধ্যমত সুখেস্বাচ্ছন্দে। এ রকম কারো কারো বেলা হয়েছেও। তখনি নিঃশেষে প্রমাণ মিলবে, এসটাব্লিশমেন্ট দেবাদিদেবকে ফেলে দিয়েছে। এখন পাঞ্চজন্যই নির্বাচিত সদস্য। এককালের জেলখাটিয়ে নয়। জরুরী অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে লিখে জেলে গেছে। ওর সততা ও সরকার-বিরোধিতার প্রমাণ। বেরোলে পরে পাঞ্চজন্যই নায়ক! যতদিন না আরেক বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বা যুবক, তাঁর সরকারের প্রয়োজনে

পাঞ্চজন্যকে খারিজ করে ক-খ-গ-কে ওপরে তোলেন। সরকারেরই প্রয়োজন হয় সরকার-বিরোধী বুদ্ধিজীবীর।

কিন্তু দেবাদিদেব ফেইল করলে তবে তো উঠবে পাঞ্চজন্যের কথা। দেবাদিদেব ফেইল করবে কেন? পাঞ্চজন্যের কথা ভাবলে একটু ভয় করে বটে, কিন্তু সে হল গে বয়সের দোষ। বয়সের, ডায়াবেটিসের, অ্যাসিডিটির দোষ। আসলে ভয়ের কিছু নেই। বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, দেবাদিদেবকে উনি তৈরি করেছেন। কিসে তৈরি করেছেন? দেবাদিদেব কি ওঁর জন্য বসেছিল? উনি যখন ছিলেন না, স্ব মহল্লায় চরকা ঘোরাতে দেখাচ্ছিলেন চাষীদের, তখন, সেই সময়েই দেবাদিদেব লিখছে। বৃদ্ধের কথাবার্তা অত্যন্ত আপত্তিকর। হেমাদ্রিরাজম! হেমাদ্রিরাজম! হেমাদ্রিরাজম না হলে কি হয়, দেবাদিদেবও পীপ্‌লের লোক।

পাঞ্চজন্য আর দেবাদিদেব। দেবাদিদেবের যে একখানা নিজস্ব অতীত আছে, সে অতীত পাঞ্চজন্যের কোথায়? দেবাদিদেবকে পাওয়া কতখানি সুবিধার। তেতাল্লিশ সাল থেকে কম্যুনিস্ট ফ্রন্টের সমর্থক।

প্রথমে ও ছিল "বাংলার কৃষক" কাগজের প্রত্যক্ষ সংবাদদাতা। তিরিশ টাকা মাইনে দিতে কাগজের হয়ে যেত। সেই সময়েই যা ঘুরে নিয়েছে দেবাদিদেব। কোথায় গেছে, কোথায় যায়নি। কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় বরিশাল, কোথায় হাজং এলাকা, কোথায় জলপাই-গুড়ি-বর্ধমান-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূম স—ব ঘুরেছে। পুরোনো সিনেমা বিষয়ে মনে যেমন স্মৃতিলাঞ্ছিত মমত্ব থাকে, সেই দিনগুলি বিষয়েও দেবাদিদেবের মনে সে রকম মমত্ব। বীরভূমে কোন্ একটা গ্রামে কে যেন 'একজন চাষী-বউ ওকে আসতে দেয়নি বৈশাখী রোদে। সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি আর কলায়ের ডাল দিয়ে লাল চালের ভাত বেড়ে দিয়ে বলেছিল, শীতকালে আসবেন, তখন খাবার জিনিস মেলে।

পাবনার কোন গ্রামে ও গিয়ে পড়েছিল হৈমন্তিক ধান-কাটা নিয়ে মুসলিম চাষীদের লড়াইয়ের মধ্যে। সে কি দাংগা। দু-পক্ষই হাতে সড়কি নিয়ে পাকা ধানের সমারোহে নেমে পড়েছিল। লাশের পর লাশ ভেসেছিল পদ্মার জলে। এমনি আরো কত অভিজ্ঞতা। খুলনায় খেয়েছিল নারকেল তেলে ভাজা লুচি, আর ভাগুন মাছ-ভাজা। যে বাড়িতে উঠেছিল, তাঁদের হাজারটা নারকেল গাছ। ভিখিরী-বোষ্টম এলে তাঁরা নারকেল দিয়ে ভিক্ষে দিতেন। "বাংলার কৃষক" কাগজে কাজ করতে করতেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে দেবাদিদেব। বর্ধমানের গ্রামে কৃষক-সমিতি গড়তে গিয়ে প্রথম বার জেলে যায়। জেল থেকেই সাম্যবাদে অনুরাগ, বিশ্বাস, আনুগত্য। এই আনুগত্য খুব দৃঢ়মূল হতে পারে। চোখে যা দেখছ, তাকেও ওপর-ওপর দেখে খারিজ করে দিতে পারে মন। সেই জন্যেই বিয়াল্লিশের আন্দোলন মনকে স্পর্শও করেনি। তেতাল্লিশে দেবাদিদেব তৈরি হয়ে যায়। হি ওয়াজ মেড। তেতাল্লিশ সালটি ওর জীবনে খুব দ্যোতক। মন্বন্তর।

স্বপ্ন, স্বপ্ন মনে হয় সব। কলকাতার পথে-পথে শবদেহ। কালীঘাট ট্রামডিপোয় দেখেছিল, মৃতা মায়ের নগ্ন কঙ্কাল বুকে জীবিত শিশু দুধ খুঁজছে। জয়নাল আবেদীনের ছবি। মরা মেয়েছেলের দেহ পড়ে আছে, শিউলি গাছ থেকে ঝরছে ফুলের পর ফুল। নিচে লেখা, "তার পরেও এল শরত"। মন্বন্তর। কালোবাজারজনিত কালো টাকায় ফেটে পড়া হঠাৎ-ধনী…নগরীর পথে-পথে না খেতে পেয়ে মরে পড়ে আছে গ্রামের মানুষ। সকালে লরীতে তোলা হচ্ছে কাঠের মত শক্ত শবগুলি। ঠক-ঠক-ঠক নিষ্প্রাণ শব্দ। কোথায় সেগুলি পোড়ানো হত? তখুনি দু-তিন বছরের মধ্যে পর পর নাটকের পর নাটক। "আগুন", "জবানবন্দী", "ল্যাবরেটরি"—সবার পরে সমুদ্রের বুকে সব চেয়ে উঁচু ঢেউ হয়ে এল "নবান্ন"। একটি নাটক মহানগরীতে যে ঝড় তুলেছিল, আজও তা মনে পড়ে।

স্বপ্ন, স্বপ্ন সব। ভারতের প্রতিটি প্রদেশ থেকে বাংলার মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে সাহায্য করার আশ্চর্য সাড়া। ভুখা হ্যায় বাঙাল!

গানে-গানে কত যে বন্ধন তখন টুটে যায়! মরণ শিয়রে দলাদলি করে কেমনে বাঁচিবি বল্! "নবান্ন"র জারি গান, "ও হোসেন ভাই দামুকদিয়া চাচা"—তখনি সেই সব গান। "অব কোমর বান্ধা হো তৈয়ার হো"—"জাগো জাগো জাগো সর্বহারা"—সবাই জানত বিপ্লব এসে গেছে। সকল দশকেই এমন বিশ্বাস আসে না। দেবাদিদেব তো জানে, এখনকার দশকের বিশ্বাস, বিপ্লবের রক্তসূর্যের প্রথম রশ্মিতে প্রথম রঞ্জিত হয়েছে অন্ধ্রের উপকূল। সে বিশ্বাসের পরও বিপ্লব আছে অনায়ত্ত। কেন বিপ্লব এ দেশে অনায়ত্তই থাকে? কোথায় কি কাজ অনারব্ধ থেকে যায়? সে সময়েই দেবাদিদেব দেখে সুকান্তকে। আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ, নম্র কিশোর। হাসলে মুখ আলোয় ভরে যেত।

সংস্কৃতির ফ্রন্ট। সাহিত্যের ফ্রন্ট। তখনি দেবাদিদেব রিপোর্টাজ লেখা ছেড়ে গল্পে নামল। প্রথম গল্পটি তার আজও সংকলনে ঠাঁই পায়। "ভুখ"। গল্পটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লেখা। সাহস ওর চিরকালই ছিল। পার্টির কাগজে সহকর্মী ছিল শশী সাঁতরা। শশীর কাছে ও বলত, দুর্ভিক্ষ নিয়ে যা লেখা হচ্ছে, কিছুই তেমন হচ্ছে না।

ভাই, সমালোচনা করেই ত গেলে, লিখে দেখাও না একটা গল্প? গল্প হবে, পড়তে ভাল লাগবে, রিপোর্টাজ হবে না।

তখনো দেবাদিদেব ভাবেনি, একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলতে পারবে। কিন্তু লিখে ফেলেছিল। গল্পটা যখন পড়া হয়, স্বয়ং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে প্রশংসা জানান। দেবাদিদেবের মনে হয়েছিল, মাণিকবাবুর ধরা হাতটা ওর ধন্য হয়ে গেল।

তুমি লেখ—মাণিকবাবু বলেছিলেন।

লিখব?

লেখ।

তখনি ও লেখে গল্পের পর গল্প। "ভুখ"; "কাকে কাঠগড়ায় এনেছ ?"; "আসামী"। প্রত্যেকটি গল্প হীরের মত উজ্জ্বল, অভিজ্ঞতায় রক্তাক্ত। তারপর ওর প্রথম উপন্যাস "আর্ত শতাব্দী"। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে বাড়িতে ডেকে পাঠান। বলেন, "খুব ভাল লিখছ ভাই, খুব খুশী হয়েছি।" তখন প্রবীণ সাহিত্যিকরা কি ভাবে ওকে অভিনন্দন জানান!

দেবাদিদেব একা আছে কথাসাহিত্যে, নতুনদের মধ্যে। আর কেউ নেই। নতুন হয়েও প্রতিষ্ঠিত সব কাগজের রবিবাসরীয় পাতায় ওর গল্প না থাকলে সে পাতা সম্পূর্ণ হয় না।

পার্কে গল্প পড়ছে, জনসমাবেশে, গল্পের লাইনে লাইনে শ্লোগান দিচ্ছে শ্রোতারা। স্মৃতির কুয়াশা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল মহীন তলাপাত্র। সিড়িঙ্গে পাকানো শরীর, ধপধপে রং রোদে পুড়ে তামাটে, লালচে চুলের সঙ্গে মানাত খুব। চুলগুলো কপালে এসে পড়ত। মহীন চেঁচিয়ে বলল, বন্ধুগণ! দেবের "আরেক ছিয়াত্তর" গল্পের পর একটি গানই গাইতে পারি আমি।

গান হোক, গান!

আপনারাও আমার সঙ্গে গান ধরুন।

গান হোক।

"জাগো জা—গো জাগো সর্বহা—রা!

গানের ঢেউয়ে জনতা উত্তাল। গায়ক, শ্রোতা, সবাই বিশ্বাস করত, দিন বদলের সময় এসে গেছে, আর দেরি নেই। তখন মহীন পার্কে বসে দেবকে শোনাত, "ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে"। মহীন তলাপাত্র আর শশী সাঁতরা যে এই দশকে নকশাল বনে যাবে, নিয়ম মত সম্মুখ সংঘর্ষে মারা যাবে, কে জানত? শশীর মা নব্বই বছরে পৌঁছেও বেঁচে আছেন। মাথাটা শশীর মৃত্যু সংবাদে আটকে আছে। তার পরবর্তী কোন ঘটনাই মাথায় ঢোকে না। সারাদিন

একটি কথাই বলেন। শুনেছ, আমার শশীকে না কি মেরে ফেলেছে?

এই একটি বাক্য সারাদিনে লক্ষ বার বলেন। একাই বলে যান। শশীর স্ত্রী এখনো ট্যাংরার কোন্ স্কুলে পড়াতে যায়, ছেলেটা থাকে বর্ধমানে। বুড়ির কথা কেউই শোনে না, ঝি ছাড়া।

উজ্জ্বল, উজ্জ্বল অতীত। ওকে তৈরি করা সোজা ছিল। পাঞ্চজন্যকে কি দিয়ে তৈরি করা যাবে? সেণ্ট জেভিআর্সের ছেলে, ইংরেজীতেই লিখত। দেবাদিদেবই জোর করে ওকে বাংলা লিখতে বলে। ছেলের এলেম কম নয়। ইংরেজী ও বাংলা, দুটো ভাষাতেই চালিয়ে যাচ্ছে জোরসে। চেহারাটা বিদ্ঘুটে। আজকালকার সব ছেলেদের মত। লম্বা ও ঝাঁকড়া চুল, উৎকট রঙিন জামা, বেলবট্সও রঙিন, কোমরে নানারঙা তিব্বতী মালা জড়ানো, পায়ে অত্যন্ত দামী জুতো, মেয়েলী ফর্সা রং। এ চেহারায় প্রশাসনের পছন্দসই ইমেজ দাঁড়ায় না।

দেবাদিদেবের চেহারা আছে? ওর ইমেজ তৈরি করতে চেহারাও দরকার। সাড়ে ছ'ফিট মনে হয়, তবে ছ' ফিট, তিন ইঞ্চি উচ্চতা ওর। কুচকুচে কালো রং, ছাঁটকদম চুল, খাঁড়ার মত নাক, তীক্ষ্ণ চোখ, ঝাঁকড়া ভুরু, কপাল ও চোয়াল চোয়াড়ে। পাথর-খোদাই পরুষ ও রুক্ষ মুখের ভাব, ভারি গলা। চেহারা দেখেই বলবন্ত ওর ভক্ত হয়।

হঠাৎ দেবাদিদেবের ভেতরে যেন ভূমিকম্প হল। বলবন্তের কথাই মনে হচ্ছিল সেই অফিসার ছোকরার ঘাড় দেখে। বলবন্ত লাল! বলবন্তের স্মৃতি কাটা-ঘুড়ির সুতোর মত ওর হাতের নাগালে লাট খাচ্ছিল আর খাচ্ছিল। দেবাদিদেব সুতোর মাথা ধরতে পারছিল না, ধরে ফেলল। ছোটবেলা, দেশের বাড়িতে, পাশের বাড়ির পলটুর সঙ্গে কাঁচের মাঞ্জা দেওয়া সুতো নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে দুজনের হাতই কেটে যায়। কি রক্ত, কি রক্ত! পলটুর মা চুন দিয়ে দু-

জনের হাত বেঁধে দেন। তখন এত টিটেনাস ইঞ্জেকশানের ধুম ছিল না। কাটলে-ছিঁড়লে দুর্বোঘাস বা গাঁদা পাতা চিবিয়ে রসটা দিলেই কাজ চলে যেত। এখন সর্বত্র বাতাস দূষিত। কথায়-কথায় ইঞ্জেকশান না নিলে ছেলেপিলের চলে না।

বলবন্ত বলত, দাদা, আপনি লেখক হতেনই।

কেন?

আপনার চেহারাখানা যা!

যাঃ! চেহারায় কি এসে যায়?

চেহারা, নাম, সব দরকার করে দাদা।

লেখক হব বলে কি জানতাম?

হতেই হবে।

তখন দেবাদিদেব সবে আসর জমিয়েছে। কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ একটি গুণী ছেলের মুগ্ধ মুখের ছবি বড় ভাল লাগত। আত্মবিশ্বাসও ছিল যে ভাল লিখছি। সেই সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার ছিল। দেবাদিদেবকে লেখার স্বীকৃতি পাবার জন্য কোন সংগ্রাম করতে হয়নি। কম্যুনিস্ট পার্টি স্বীকৃতি পাবার পর বিশাল এক শিক্ষিত সমাজ কম্যুনিস্ট পার্টির আওতায় আসে। ফলে একটা আগ্রহী পাঠকসমাজ তৈরিই ছিল। প্রবীণ লেখকদের মধ্যে নতুন প্রতিভাবান লেখককে টুঁটি টিপে ধরবার হিংস্র মানসিকতা ছিল না, তা দেবাদিদেবও স্বীকার করবে। তাঁরা উৎসাহ দিতেন, প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকা ওর লেখা ছাপত, ফলে পুরনো পাঠকসমাজের কাছে ও পৌঁছে যায়। আশ্চর্য কি, বলবন্তের স্তুতি ওর ভাল লাগবে?

ফাসী-বিরোধী সাহিত্যসভায় ওর "আর্ত শতাব্দী" উপন্যাসটি দিয়ে একটি ছেলে বলেছিল, সই করে দিন।

তুমি কে, ভাই?

পার্টির হোলটাইমার একজন।

নাম?

বলবন্ত লাল।

লাল?

বিহারী। তবে বাংলা পড়ি, জানি।

বাঃ! কথায় কোন টান্ নেই তো?

তা থাকবে কেন? কলকাতায় তিন পুরুষ।

তখনি শশী সাঁতরা বলেছিল, ওকে চেন না? ট্রাম মজুর কর্মী দশরথ লালের ছেলে। ওর ঠাকুর্দা ঘোড়ায়-টানা ট্রাম চালিয়েছে, বাপ এই ট্রাম চালাচ্ছে, ছেলে হয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির হোলটাইমার। ওর আরেকটা পরিচয় জানো?

কি?

হিন্দীতে গল্প লেখে। "নভ্ মেঁ পতাকা" গল্পটা তো ওরই লেখা। দারুণ গল্প। "নভ্ মেঁ পতাকা নাচত হ্যায়" গানটা শুনে লেখা।

বাঃ! শুনলেও ভাল লাগে।

অনেক গল্প লিখেছে।

বলবন্ত, একদিন আমার বাড়ি এসো।

যাব।

সেই যে কথাবার্তা হল, আর ওর দেখা নেই। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল দেবাদিদেব। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরছে, শোনে, কে ওকে ডাকছে, দাদা! অ দাদা!···পেছন ফিরে দেখে বলবন্ত।

কি ব্যাপার? এলে না তো?

এই তো এসেছি। বলেন কেন, ধাপার মাঠে পড়েছিলাম এতদিন। সেখানে কত লোক যে থাকে, তা জানতামই না। ওদের ওপর রিপোর্টাজ তৈরি করছিলাম। অনেক ছবি এঁকেছি ওদের।

তুমি ছবিও আঁক?

হ্যাঁ দাদা। চিত্তপ্রসাদদা তো ছবি দেখে আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, আমার ছবির হাত আছে।

মস্ত সার্টিফিকেট পেয়ে গেছ।

চিত্তপ্রসাদদার মত একটা ছবিও যদি আঁকতে পারতাম!

সবাই কি চিত্তপ্রসাদ হয়?

কথাটা দেবাদিদেব খুব সুপিরিয়ার গলায় বলেছিল। পরে বলবন্তের আঁকা ছবি দেখে ও চমকে যায়। ও বোঝে, আঁকা নিয়ে পড়ে থাকলে বলবন্তও বহুদূর যাবে। লেখে ভাল, আঁকে ভাল, তখনি মনে কেমন একটা জ্বালা ধরে যেহেতু প্রকৃত কম্যুনিস্ট সর্বদা আত্ম-সমালোচক, সেহেতু স্বীয় মনোভাবটি ঈর্ষা না অন্য কিছু, তা দেবাদিদেব বলবন্তের সঙ্গে চলতে চলতেই ভাবতে শুরু করে। ভাবতে ভাবতেই ওরা পৌঁছে যায় দেবাদিদেবের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে বলবন্ত যেন কেমন "কিন্তু" হয়ে যায়। খুব সাধারণ ও শোভন-সজ্জিত বসবার ঘর। ঈপ্সিতা কয়েকটা বিদেশী ছবির প্রিন্ট পেয়েছিল বিয়েতে, তাই বাঁধানো, দেয়ালে ঝুলছে। ফুল। ঘরে ফুল রাখা তখন খুব বুর্জোয়া ব্যাপার বলে গণ্য হত। ফুল, রবীন্দ্রনাথ—ভালো লাগা, একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে বাস করা, এই দেখলেই পার্টির প্রবক্তারা কপালে চোখ তুলতেন। সম্ভবত বলবন্ত ফুল দেখে রিঅ্যাক্ট করে যায়। ঈপ্সিতাকে দেখেও। ঈপ্সিতার চেহারায় "ফাইট করে রাইট আদায় করব" গোছের ভয় দেখানো ঘোষণা ছিল না। খুব পরিষ্কার মানুষ ও, তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যেত। ফর্সা রং, পরিষ্কার নাক চোখ-মুখ। ফ্যাশন নেই, আভিজাত্য আছে।

ঈপ্সিতা, এই যে বলবন্ত।

নমস্কার বউদি।

নমস্কার, বোস তোমরা।

একটু চা···?

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পরিষ্কার ঢাকনি-ঢাকা ট্রে-তে চা, চিঁড়েভাজা, নিমকি পাঠিয়ে

দেয় ঈপ্সিতা। দেখে বলবন্ত আরো "কিন্তু" হয়ে যায়। প্লেটে ঢেলে হুশহুশ চা খায়, ময়লা হাতে থাবা-থাবা চিড়েভাজা তোলে।

বাড়ি আপনার নিজের, দাদা ?

না-না. ভাড়া বাড়ি।

আই বাস্!

আরে সামান্য ভাড়া।

কত ?

পঞ্চাশ টাকা।

পঞ্চা—শ টাকা ? ঘর ক' খানা ?

ছ' খানা।

না-না দাদা, সাধ্যের অতিরিক্ত স্ট্যান্ডার্ডে বাস করতে নেই। ছোট ফ্যামিলি, ছোট বাড়িতে চলে যান।

এখন এর চেয়ে ছোট বাড়ি কি পঞ্চাশ টাকায় মিলবে ?

মিলবে না ? বলেন কি ? বস্তির কাছে এখনো বিশ টাকায় বাড়ি মেলে। কতজন থাকেন ?

দেবাদিদেব এখন বাপের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয় সবটা। বলে, বাবা তো অসুস্থ, এ পাড়ায় ডাক্তার চেনাজানা। আমি বাড়িতে কমই থাকি। বাবার কিছু হলে তোমার বউদি চেনাজানা পাড়ায় পাঁচজনার সাহায্য পাবে। সেই জন্যেই ছেড়ে যাবার কথা ভাবিনি।

মনে মনে খুব বিরক্ত হয় দেবাদিদেব। কম্যুনিস্ট পার্টি সকলকে মেলবন্ধনে বেঁধেছে সত্যিই, কিন্তু পার্টিতে সকলে সকলের ব্যক্তিজীবন নিয়ে শুভেচ্ছা দেখাতে আসে, এও সত্যি। 'এ তুমি করতে পার না কমরেড!' বলে, সকলে সকলকে নিয়ে আলোচনায় নামতে পারে। ব্যক্তিজীবনকে এতখানি হাটবাজারী করে তোলা দেবাদিদেবের পছন্দ নয়, কিন্তু বলবন্তকে তা বোঝানোও সম্ভব নয়।

বলবন্ত বলে, পঞ্চাশ টাকা যে অনেক টাকা দাদা!

তা তো বটেই।

বাড়িটার ভাড়া কে দেয় ?

এখনো বাবাই দেন।

তারপর কি করবেন ?

কি জানি !

কে কে থাকে ?

আমি, বউদি, বাবা।

তিনজন লোকের জন্যে তো দুখানা ঘরই যথেষ্ট। বাকি ঘরগুলোয় পার্টি কম্যুন করে দিন না ? সত্যেনদা তো তাই করেছেন।

তখনো ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার মধ্যে দুশো আইনকানুন ঢুকে পড়েনি। এ কথাও সত্যি যে, কলকাতায় পার্টি কম্যুন হচ্ছিল একের পর এক।

সে কথাও মনে আছে বলবন্ত।

জেলায়-জেলায় তাই করছে কিন্তু।

জানি।

আপনি খুব লাকি।

কেন ?

পার্টির কাজে দেবার মত কত কি আছে।

বাড়ির কথা বলছ ?

বাড়ি আছে, আর নিজেকে তো আপনি দিয়েই দিয়েছেন।

যতদিন বাবা আছেন, ততদিন বাড়ি নিয়ে কিছু করা যাবে না।

তাও তো বটে !

এই তো সব ঝামেলা।

আচ্ছা দাদা ?

বল।

একটা কথা বলছি, দোষ নেবেন না ?

বল না।

একথা কি সত্যি, বউদি একেবারে আপোলিটিকাল ?

হ্যাঁ।

বউদিকে বিয়ে করার আগে আপনাকে বলতে হয়েছিল যে, আপনি কেন একেবারে আপোলিটিকাল মেয়েকে বিয়ে করছেন ?

হয়েছিল।

কেন করলেন ?

দেবাদিদেব বেজায় চটেছিল এবং শুভ্র হেসে বলেছিল, ভালবাসা যে অন্ধ ভাই। ভালবাসার কাছে কোন যুক্তি যে খাটে না।

নিশ্চয়।

অথচ আসল ব্যাপারটি অমন নিমেষে সমাধা হয়নি। রীতিমত আলোচনা সভা বসে ও দেবাদিদেবকে ব্যাখ্যা করতে হয় কেন সে ঈপ্সিতাকে বিয়ে করছে। অশোক ডাক্তার পার্টির বিশ্বাসভাজন। সে ঈপ্সিতাকে চিনত। ঈপ্সিতা অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জনের মেয়ে। অশোকই দেবাদিদেবকে ও বাড়িতে নিয়ে যায়। এ পর্যন্ত সবটাই পার্টি বুঝেছিল। কিন্তু ও বাড়িব মেয়েকে বিয়ে ? একেবারে বিয়ে ? কেন ? ললিতা কি দোষ করল ? ললিতার সঙ্গে দেবাদিদেবের বিয়ে হবে বলেই তো সবাই জানত। পার্টির লোক, পার্টির মেয়েকে বিয়ে করবে না কেন ? পার্টির ছেলেরা পার্টির মেয়েদের বিয়ে করবে, তাদের উত্তরপুরুষও হবে পার্টির মানুষ। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেবাদিদেব বলেছিল যে, পার্টির মেয়ে তাকে বিয়ে করে লাভ কি ? ঈপ্সিতা হল ভাল মেটীরিয়াল। ওকে কনভার্ট করতে পারলে আমি বেশি সুখী হব। সেটা বেশি দরকারও বটে।

শশী সাঁতরা বলেছিল, আমরাই ভাল আছি। বহুদিন বিয়ে হয়েছে। বউ পার্টি বোঝে না, স্বামী বোঝে। স্বামী যখন পার্টির কাজ করছে, তখন পার্টি একটা ভাল জিনিস, এই ওর ধারণা।

চন্দ্রনাথ মৌলিক নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, তুমি হালায় আছ ভাল। আমার বউ অতশত বুঝে না। সেদিন জিগাইল, পার্টির

কাম কর, তা পাও কত? ছিরা জুতা পায়ে দিয়া ঘুর ক্যান্? তোমাগো পার্টিতে বেতনবৃদ্ধি নাই? বুঝ কারবার।

মোহনদা প্রবীণ বয়স্ক লোক। তিনি বলেছিলেন, কমরেড, আপনাদের উচিত হবে স্ত্রীদের পড়িয়ে-বুঝিয়ে পার্টির দরদী করে তোলা।

চন্দ্রনাথ বলেছিল, দরদ দিয়া কি অইব? আধা বানান্ দরকার। তা হে কথা কইমু! পোস্টার সাঁটনের লিগ্যা যত আঠা চাই, হে বানাইয়া দেয়। 'না' বলে না।

মোহনদা ভাবাবেগী মানুষ। তিনি বলেছিলেন, এও তো দরদ, আমাদের বোনদের এ সব কাজ কি কম দামী?

শেষ অবধি দেবাদিদেবের বিয়ের ব্যাপার স্যাংশান পায়। শিল্পী-সাহিত্যিকদের বড় স্নেহের চোখে দেখত পার্টি।

বলবন্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও সব কথাই ফিরে ফিরে মনে করেছিল। সব কথাই। কিন্তু বলবন্ত কি কম নাছোড়বান্দা?

দাদা,আরেকটা কথা বলব?

বল না।

সবাই আমরা পার্টি কাডার, সবাই আমরা সমান। আর আমি ত সবচেয়ে বড় ঘরের ছেলে—মজদুরের ছেলে--তবুও ভদ্রলোক কমরেডের বাড়িতে এলে লজ্জা লেগে যায়। কেন?

কেটে যাবে বলবন্ত, কমরেড কমরেডই। কমরেডে-কমরেডে কোন তফাত নেই। এটা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে।

দাদা, সেই বিশ্বাসই বিশ্বাস, যা ভেতর থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে, উপলব্ধি থেকে আসে, তাই না? বলুন?

না-না বলবন্ত, ও সব থিওরি এখন চলে না।

আজ দেবাদিদেব বোঝে, বলবন্তের কথাই সত্যি। কিন্তু এ কথা যে সত্যি, সে উপলব্ধি তো আসে অনেক ভুল করে-করে প্রৌঢ়ত্বে পৌছলে, অভিজ্ঞতায় বয়স্ক হলে। বলবন্ত কি করে তখনি এ কথা

বলেছিল? বলবন্ত কি জেনেছিল, আয়ু ওর নেই' তাই খুব তাড়াতাড়ি অভিজ্ঞ হয়ে যাচ্ছিল?

দাদা, সবাই যখন কমরেড, সকলের জীবনযাত্রা একরকম হওয়া উচিত নয়? এ কথাটা আমার খুব মনে হয়।

দেবাদিদেবের হাসি পেয়েছিল। রাজার ছেলে, জমিদারের ছেলে, কলকাতার বড়-বড় বনেদী ঘরের ছেলে আজ পার্টি কমরেড। সারাদিন পার্টি করে শরীর ফিরতে চায় সেই ঘরে, যেখানে সুখ, আলোকিত ঘর, নরম বিছানা, সিল্কের পায়জামা-স্যুট, নরম চটি অপেক্ষা করে থাকে। দেবাদিদেব রাজা বা জমিদার নয়। কিন্তু বাড়ি হল বাড়ি। বাড়ি ফিরলে চাই সব কিছু তৈরি, হাতের কাছে, ঝটপট। তৈরি খাবার, চা। শীতকালে স্নানের গরম জল।

দেখ বলবন্ত, এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

কিসের মধ্যে?

এক-একজন, এক-এক রকম পরিবেশ থেকে এসেছে। পরিবেশও পালটে যাবে, তা কি ঝটপট হয়?

পালটে দিলেই হয়।

বাড়ির লোকেরা মানবে কেন?

বাড়ির লোকদের যারা পার্টির নির্দেশ বোঝাতে পারে না, বাড়ির লোকদের যারা কনভার্ট করতে পারে না, তারা নিষ্কর লোককে কেমন করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কনভার্ট করবে?

দেখ, মধ্যবিত্ত ঘরের কমরেডদের দিকে চেয়ে তুমি এসব কথা বলছ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো কোনো চরিত্র নেই? শ্রমিক ও কৃষকরা সবচেয়ে মূল্যবান। তাদের বুঝিয়ে কনভার্ট করলেই পার্টির কাজ এগোবে ভাল।

তারা রাইট কজ খুব বোঝে দাদা। কবে তারা আন্দোলনে এগোয় না, মরে না? নেতারাই তাদের ফেইল করেন।

সব কি তুমি বোঝ?

বেশ তো দাদা, আপনার ওপর আমার খুব রেস্‌পেক্‌ট, আপনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিন না কেন ?

বেশ বলছি।

বলুন !

তোমার মনে হচ্ছে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কমরেডরা বাড়িতে একরকম জীবন যাপন করে, পার্টিতে আরেক রকম, এর মধ্যে একটা বিরোধিতা থেকে যাচ্ছে।

হ্যাঁ দাদা। সে রকম জীবন তো খুব নিরাপদ। কিন্তু এখন, এ সময়ে কোন সাচ্চা কম্যুনিস্ট কি নিরাপত্তা খুঁজতে পারে ? দেখুন না এঁদের—

কাদের কথা বলছ ?

দীপকদা রাজা মানুষ। তাঁর বাড়ি জমিজমা স—ব দিয়ে দিয়েছেন পার্টিকে। সব দিয়ে দিয়েছেন, তবে তাঁর কিচ্ছু নেই তো ? শুনলাম, ওঁর মস্ত বাড়ি সানিপার্কে। চাকর-দরোয়ান-মালী-গাড়ি—এলাহি ব্যাপার। তাহলে কোন্‌টা সত্যি ? সব দিয়ে দিলে পরে ওই "কিচ্ছু না" যা, তাতেই তো একহাজার গরিব কমরেডকে আরামে রাখা যায়।

দেবাদিদেব ভেতর-ভেতর অস্বস্তি বোধ করে।

তারপর দেখুন, ব্যারিস্টার কমরেডদের কাণ্ডকারখানা। কার বাপের দেওয়া বাড়ি, কার অন্য কারো দেওয়া বাড়ি···

বলবন্ত, শোন······

একেক সময়ে মনে হয়, আমরা শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলি, কিন্তু ঠিক ভাবে না চললে দেখব, পার্টিতেও এসে গেছে শ্রেণীবিভাগ।

আজ দেবাদিদেব জানে, বলবন্ত ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত কথা বলেছিল। কম্যুনিস্টদের মধ্যে তখনো ছিল শ্রেণীবিভাগ। ধনীর দুলাল দীপক নন্দী, ব্যারিস্টার কমরেড বঙ্কিম রায়, সুধীন্দ্রিয় গুহ, এদের কখনো এমন কাজ করতে হয়নি, যে জন্যে না-খেয়ে পার্টির হোলটাইমার

ওয়েজ সম্বল করে কাজ করতে হয়। অন্ধ্রের প্রশান্ত মাহেন্দ্র তো উত্তরবঙ্গের চা-বাগান কর্মীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে যক্ষ্মা হয়ে মারা যায়। মৃত্যুর পর একটা ঠিকানা-ভুল চিঠি প্রশান্তকে খোঁজ করে করে এসেছিল। প্রশান্তর পিসিমা লিখেছিলেন, শ্রীচরণে নিবেদন, কম্যুনিস্ট পার্টি সংঘম্, তিরুপতির নাম করে প্রার্থনা জানাই, আমার মাতৃহীন ভাইপো প্রশান্ত অনন্তম্ মাহেন্দ্রকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।···এ রকম বহু কমরেড বেঘোরে মরেছে, মুছে গেছে চিরতরে, বড় ঘরের কমরেডদের আজও অন্যান্য চেহারায় দেখা যায়। কে যেন বড় ঘরের বড় বড় কমরেডদের বাম হাত হতে দক্ষিণে লন, দক্ষিণ হতে বামে, দক্ষিণে ও বামে, দক্ষিণ হতে দক্ষিণে, কিন্তু বাম থেকে বামে এঁদের দেখা যায় না। সেখানে আবার নতুন কমরেডদের ভিড়।

দেবাদিদেব বলবন্তের কথায় খুবই বিব্রত বোধ করে। ও বলে, জনযুদ্ধ চলছে বলবন্ত। এই যুদ্ধে ফ্যাসী শক্তির পতন হবে, অতএব এই যুদ্ধ খুবই জরুরী ছিল।

বলবন্ত এ সময়ে গুনগুনিয়ে গেয়েছিল, শেষ যুদ্ধ শুরু আজ ক—মরেড!

তারপর দেবাদিদেব বলেছিল, ভারত কি এ রকমই থাকবে; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখানেও আসবে। আমরা সবাই তারই কারিগর বলবন্ত। বর্তমান সময়টা তারই প্রস্তুতি পর্ব।

জানি দাদা।

এ সময়ে কে হোলটাইমার ওয়েজে ছাতু খেয়ে পার্টি অপিসের টেবিলে ঘুমোচ্ছে, কে বাড়ি ফিরে আরাম করছে, সে সব ছোট কথা ভেবে মনকে ক্লান্ত কোরো না। আমি বলছি, এ ভাবে ভাবনা করাটা ঠিক নয়।

বেশ, ভাবব না।

বলবন্ত হেসে জবাব দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, পেচ্ছাপ করব দাদা।

দেবাদিদেব ওকে বাথরুম দেখিয়ে দেয়। কিন্তু পরিষ্কার বাথরুম দেখে বলবন্ত বলে, না দাদা, অভ্যেস নেই। আমি রাস্তায় সেরে নেব। এ বেজায় বুর্জোয়া ব্যাপার।

আজ, নিষ্পাপ পাহাড়ে শুচি-সবুজ ঘাসে শুয়ে, শরীরে বাতাস-দোলন ডেইজি ফুলের বাতাস লাগছে। হাত তুটো ছড়িয়ে দিল দেবাদিদেব, পাশ ফিরল। মুখে ডেইজি ফুলের পাপড়ি লাগছে। ফুলগুলি যেন তাকে কি বলছে। জরুরী মেসেজ। এখানে যতক্ষণ আছ, আমাদের মত হয়ে থাকো। দেবাদিদেব যে তা পারে না। ফুলের মেলায় হারিয়ে যেতে, ঢেউ খেলানো বরফ-পাহাড়ে মিশে যেতে। তোমরা দেবাদিদেবকে ক্ষমা কোরো। দেবাদিদেব কি তুর্ভাগা যে, তাকে ফুলগুলি ক্ষমা করবে?

এখন মনে হল, ঈপ্সিতা সেদিনও বলত, তোমার মধ্যে আছে স্ববিরোধিতা। তোমার মত, তোমার জীবনযাত্রা পরস্পর বিরোধী। কিন্তু সেদিনই বা কি করতে পারত দেবাদিদেব? ও একাই কি ঈপ্সিতার অর্থে স্ববিরোধিতা করত সেদিন? সতুর "মহাজীবনের গান"! সতুর গলায় আশ্চর্য ধরণের গান "চলো মুক্তি পথে" নিরীহ, নম্র, ভদ্র! জমিদারের ছেলে কে বলবে? এই সতুর প্রতিই কি সুবিচার করেছিল দেবাদিদেবরা? কেন সিনেমায় সংগীত-পরিচালনায় গেল? একদিন দিল্লী, এখন কলকাতায়। চোখে-মুখে শিশুর সারল্য, আর শুভ্র হাসি নিয়ে সেই একই রকম।

স্ববিরোধী ছিল কি দেবাদিদেব একাই? দেবাদিদেবের সঙ্গে যারা ছিল সাথের সাথী, সেই গান, "সাথী! সাথী! কাঁধে কাঁধ মেলাও"। সেদিন যারা ছিল সাথের সাথী, কতজন আজ সমাজের থাম, বিভিন্ন সংস্থায় সর্বোচ্চ পদে আসীন? একজিকিউটিভদের পার্টি। তারা দেবাদিদেবের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সমর্থন করে। তাদের সমর্থনই দেবাদিদেবের নিশ্বাস নেবার বায়ুমণ্ডল রচনা করে রাখে। পশ্চিমবঙ্গের রক্তোৎসবের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবাদিদেব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় বুদ্ধিজীবী কমিটি গড়ুক—তাদের সমর্থন আছে। জয়প্রকাশের সপক্ষে সই দিক, সমর্থন আছে তাদের। জয়প্রকাশের বিপক্ষে সই দিক, তাদের সমর্থন আছে।

বলবন্ত একাই রাস্তায় বসে পেচ্ছাপ করত না। তার পক্ষে আচরণটি ছিল স্বাভাবিক। আজকের টপ বস্‌রা অনেকেই সেদিন দেবাদিদেবের সাথের সাথী হবার জন্যে, জনতার ইমেজে জনতার সঙ্গে এক হবার জন্যে পথের পাশে বসে হিসু করে অসীম আনন্দ পেতেন। তাঁদের কাছে সেটি ছিল প্রোলেতারিয়ান জেস্‌চার। আজকের এক নেতা শৈশবেও "বাঁদর" শব্দটা অবধি উচ্চারণ করেননি। ১৯৪৪-এ এক সভার শেষে তিনি উজ্জ্বল মুখে বললেন, ভাই দেবু! আজ আমি একটা খারাপ কথা বলেছি "শালা"। কি জানো, বলে ফেলে খুব লিবারেটেড মনে হচ্ছে নিজেকে।

দেবাদিদেব বলেছিল, নিজের এক আত্মীয়ের নাম করেই লিবারেটেড হলেন দাদা?

বলবন্ত এদের সকলকেই বিশ্বাস করত। কিন্তু না, দেবাদিদেবের মধ্যে ছিল না কোনো কপটতা। উক্ত আচরণগুলিও ছিল বিশ্বাসের পরিণাম। ওরা বিশ্বাস করত, ওরা ঠিক কাজ করছে। মণি প্রামাণিক অসহযোগের সময় থেকে মাটে-ঘাটে বাস করে এসেছে। ও বলত, আরে এইভাবে জনগণের কাছে যাওয়া যাবে না। ওসব করে কিস্‌সু হবে না। বেজায় সিনিক ছিল। অন্ত্রে ক্যানসার হয়ে মরে গেছে কবে।

বলবন্ত! বলবন্ত লাল! দেবাদিদেব ওর মনের আকাশে লাল সূর্য। সেই গান, "দেখো সুরুখ্‌ সবেরা আতা হ্যায়, আজাদীকা! আজাদীকা!" ১৯৪৪-এ দেবাদিদেবের বয়স একত্রিশ, ওর বয়স উনিশ। বস্তি-বেল্টের খবর-লিখিয়ে কমরেড। বস্তিও, বলবন্তের কর্মক্ষেত্রও ছিল চুরাশিটা নরকের কুণ্ড। এখনো তাই। মানুষ খোঁয়াড়ে বসবাস করে, এ-ওর ঘাড়ে মলত্যাগ করে, কদর্য ও দূষিত জল খায়, মদ খেয়ে

এ-ওকে পেটায়। শুধু এখনকার বলবন্তরা তাদের মধ্যে বাস করতে যায় না।

সেখানে থাকত বলবন্ত। দেবাদিদেব খুব নিশ্চিন্ত বোধ করত। বস্তিবাসীদের মধ্যে বাস করে তাদের কথা লেখা উচিত, তা সে মানত। কিন্তু নিজে সে-কাজ করতে পারত না বলে বিবেক দংশাত। বলবন্ত সে-কাজ করছে, ভাবলেও খুব নিশ্চিন্ত লাগত তার। ঘুমোতে পারত দেবাদিদেব। বলবন্ত ওকে ঘুমোতে দিত।

মাঝে মাঝেই এসে হাজির হত। ততদিনে ঈপ্সিতার সঙ্গে ও খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ওকে দেখলেই ঈপ্সিতা বলত, কোনো কথা নয়, আগে চা খাও, তারপর পেট ভরে চা-খাবার খাও, তারপর শুয়ে থাকো বাইরের ঘরে।

বলবন্তের বাবা একবার ঈপ্সিতার জন্যে একগোছা কাচের চুড়ি আর একখান মেটে সিঁদুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর আধভাঙা গমের লাড্ডু। মা ছিলেন না ওর!

দেবাদিদেবকে দেখলেই বলবন্ত চার্জ করত, কেন, কেন মানুষ এই জঘন্য ভাবে বাঁচবে? কি তাদের দোষ? কে তাদের কথা লিখবে? কবে সে কথা লেখা হবে?

তুই লেখ্।

ততদিনে বলবন্ত দেবাদিদেবের কাছে "তুই" হয়ে গেছে। দেবাদিদেব কিন্তু "আপনি" রয়ে গেছে। "তুই লেখ্" কথাটি বলবন্তকে শেষ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। শব্দ মাঝে মাঝে কি বলশালী!

হাঁ, জরুর লিখব।

কি লিখবি, গল্প?

না দাদা, গল্প লিখব না। যা দেখব তাই লিখব। গল্প দিয়ে অমন নগ্ন সত্য ছোঁয়া যাবে না।

গর্কির "লোয়ার ডেপ্থ্স্" পড়েছিস?

ভুলে গেছি। লোয়ার ডেপ্থ্ রোজ দেখছি যে।

বলছিলাম. গল্প করে সত্যি কথা লেখ ।

ইংরিজীতে ?

নয় কেন ?

ইংরিজীতে লিখলে অনেক বেশি লোক পড়বে।

নিশ্চয় ।

দাদা, আইডিয়াটা খুব ভাল।

পারবি ?

দেখি। ইংরিজীতে ভালই তো ছিলাম।

বিশেষ একটা পেশা যাদের আছে, তাদের বস্তিতে গেলে খুব ভাল হয়।

বাঃ দাদা! পথ দেখিয়ে দিলেন। আজ আমি বউদিকে গান শোনাব। .বউদি আমার জন্যে লুচি ভাজছে।

পেট ভরে লুচি খেয়েছিল বলবন্ত। ঈপ্সিতা ও বলবন্ত পরস্পরের সঙ্গে কত সহজ, তা দেখে দেবাদিদেব অবাক হয়ে যায়। সেদিনই দেবাদিদেব জেনেছিল, ঈপ্সিতা বলবন্তের জন্যে একটা লাল রঙের সোয়েটার বুনছে।

কেন ঈপ্সিতা ?

কেন নয় ? কোথায় কোথায় ঘোরে, ঠাণ্ডা লাগার ধাত !

দেবাদিদেব তাজ্জব বনে যায়। সেদিনই ও জানে, বলবন্তের খুব চটপট ঠাণ্ডা লাগে। আরো জানতে পারে, ঈপ্সিতা বলবন্তকে উইনকারনিস কিনে দিয়েছে দু' শিশি।

বলবন্ত লুচি খেল, সোয়েটার বোনা হয়ে গেলে পরতে আসবে বলে কথা দিল। তারপর কোথায় যে ডুব মারল, আর তার দেখা নেই। ঈপ্সিতা ওর জন্যে সোয়েটার বুনল। ও আসবে বলে ঈপ্সিতার কি ব্যাকুলতা। দেবাদিদেব ব্যাকুল হবার সময় পায়নি। অনেক বড় বড় কাজে ব্যস্ত ছিল সে। ঈপ্সিতাকে বলত, অত ওর জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না তো! বলবন্ত যেন বেপাত্তা হয়ে গেল।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখে অদ্ভুত দৃশ্য। বলবন্ত সম্ভবত স্নান করেছে। খুব ঝকঝকে হয়েছে। তবে চেহারা হয়েছে কালিবর্ণ ক্যাবলাদের মত, পোশাক ভিখিরির অধম। চোখ দুটো জ্বলছে উত্তেজনায়, আনন্দে। যক্ষ্মা! বলবন্ত চেঁচিয়ে বলল, দাদা, কামাল কর্ দিস্!

কি করেছ?

"ফ্রম দি লোয়ার ডেপ্থ্স্" নামটা কেমন লাগছে?

কিসের নাম?

চামার-বস্তির দেড়শো মেয়ে-মরদ-ছেলেপিলের সঙ্গে দেখা করে ডিরেক্ট রিপোর্টাজ। দাদা, গল্প আমাকে বানাতে হয়নি। ওদের জীবনগুলোই গল্প দাঁড়িয়ে গেছে। দাদা, আই হ্যাভ ডান ইট। দেখুন না।

দেবাদিদেবের হাতে একটা পাতা ধরিয়ে দিয়ে বলবন্ত কাসতে শুরু করে। কাসির শব্দটা ভয়ঙ্কর ফাঁকা-ফাঁকা। শুনে ঈপ্সিতা চমকে ওঠে। শুনেই বোঝা যায়, কাসিটা যেখান থেকে বেরুচ্ছে, সেখানে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ওর ইংরিজীতে একটা অন্য স্বাদ ছিল। খুব মেধাবী বলে হিন্দী স্কুলে আগাগোড়া ফ্রি পড়েছিল। বাবা দশরথ লাল প্রবীণ ট্রাম মজুর। খুব আদরের ছেলে। ছেলের লেখাপড়ায় বাবার খুব সম্মতি ছিল। ওর ইংরিজী সায়েবী ইংরিজী নয়, ওর নিজস্ব ইংরিজী।

খুব স্বল্প জীবনসীমা, মাত্র কয়েকটি লেখা। বলবন্ত এতকাল পরেও একটা গর্ব করার মত নাম। যে চামার-বস্তি নিয়ে বলবন্ত লিখেছিল, সেখানে এখন পিকনিক গার্ডেনস্ তৈরি হয়েছে। বাড়ির পর বাড়ি। সেদিনই গিয়েছিল দেবাদিদেব সেখানে। সতু রায়ের বাড়ি। বাড়ির পর বাড়ি দেখতে দেখতে ওর মনে হল, এই সেই জায়গা। এখন সেখানে কদর্য কোনো বস্তি নেই। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে, কিন্তু চাম-মজদুররা সে-সব বাড়িতে থাকে না।

আজ বলবন্তের বিষয়ে সব কিছু লেখা হয়ে গেছে। কত লেখা দেবাদিদেব তো নিজেও লিখেছে। ওর ইংরিজী নিয়েও কলিংহ্যাম বেশ প্রশংসা করেছে। "আই রাইট ফ্রম দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌'— বলবন্তের লেখার প্রথম প্যারা পড়েই দেবাদিদেব চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। হেরে গেছে ও, একেবারে হেরে গেছে। বলবন্তের লেখা জীবনের যন্ত্রনার্ত শরীর থেকে কেটে তোলা রক্তাক্ত টুকরো। দেবাদিদেব সাধ্যমত চেষ্টা করলে কি হয়, তার লেখা মধ্যবিত্তের শিল্পিত লেখা। দেবাদিদেব তখনি বুঝেছিল, বলবন্তই ওর প্রতিদ্বন্দ্বী।

বি অনেস্ট, বি অনেস্ট দেবাদিদেব, ডেইজি ফুলের গন্ধে ডুবে গিয়ে ও নিজেকে বলল, বি অনেস্ট। ঈপ্সিতা, এই নির্জনে, পাহাড়ে শুয়ে আমি অনেক সত্যি কথা বলে যাচ্ছি।

বলবন্তের লেখার প্রথম লাইন পড়েই আমার গোর্কির কথা মনে পড়ে। তরুণ গোর্কির আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড শেষ হচ্ছে এক ঋজু ভাষণে, "সো আই ওয়েন্ট আউট টু দি ওয়ার্ল্ড্‌"। বলবন্ত আমাদের গোর্কি। সেও বেরিয়ে পড়েছিল বাইরের দুনিয়ায়। ভারতে বাইরের দুনিয়া দেখতে হলে স্ব-জীবনের বৃত্ত ছেড়ে মানুষের জীবনে ঢুকে যাও। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে। বলবন্ত তাই গিয়েছিল। গিয়ে ওর অবস্থা হয়েছিল ভয়ংকর। একটা মানুষ হঠাৎ যদি মহাবিশ্বে পৌঁছে যায়, তখন ও সব দেখতে পায়। প্রথমেই সে ভয় পাবে। দেখবে, সে যে-ডাইমেনশনে পৌঁছেছে, সেখানে কোটি সূর্য খেলা করছে। সে গ্রহ পৃথিবীর মানুষ। পৃথিবীর মানুষের কাছে একটা সূর্যই বিস্ময়। সূর্যের প্রতীকীভবনের শক্তি এমন দুর্বার যে, বেদের ঋষিরা থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি সবাই সূর্যকে নানাভাবে দেখে গেলেন, আজও সূর্য কবি-লেখকের কাছে নতুন-নতুন সংজ্ঞায় দেখা দিচ্ছে। মহাবিশ্বে পৌঁছে মানুষ দেখবে কোটি-কোটি সূর্য পুড়ছে, কোটি-কোটি যোজন চিরতুষার তুহিন হয়ে আছে।

বলবন্ত দেখেছিল, তার দেখা জীবনের অভিজ্ঞতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

চামারদের জগৎটা মহাবিশ্বের মত ভয় দেখানো। কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধ, বস্তির চলাচলের পথ পায়খানা ও কাদায় পিছল, প্রতি ঘরের মেঝে কাদা ভসভসে, চাল ভাঙা। একই ডোবার পাঁক-দুর্গন্ধ জলে স্নান-রান্না-পান—শুয়োরে মানুষে বাস। ঘরে-ঘরে যক্ষ্মা-কুষ্ঠ-ক্রিমি-প্লীহা-রক্তাল্পতা। মালিক মহাজনের কাছে দাদন নেবার সময়ে চামাররা সন্ত্রস্ত থাকে, তাদের ছায়া যেন মহাজনের গায়ে না পড়ে। দেখেছিল, মুদি সওদা দেয় এদের কোঁচড়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে। বলবন্ত যেদিন যায়, তার পরদিন গোকুল চামারের মেয়ে আগুনে পুড়ে যায়। কচি মেয়ে। ডাক্তার তাকে ছুঁয়েও দেখেননি। বললেন, কম্যুনিস্ট বুঝি? অ! তাই বলি, চামারের জন্যে এত দবদ কি ভদ্দরলোকের হবে?

ডাক্তার জানতেন, কম্যুনিস্টরা ভদ্দরলোক নয়। বলবন্ত তারপর মলম টলম কিনে আনে। বাচ্চাটা বেঁচে ওঠে এবং এ রকম কয়েকটি ঘটনার পর বলবন্তকে ওরা আপনজন মনে করে এবং বলবন্ত এবার মহাবিশ্বের মেকানিজমের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছয়। চামারদের, চাম-মজদুরদের জীবন মহাজনের কাছে বাঁধা। ওদের পেশাটি সকলের চোখে ঘৃণ্য। সে কারণে দোকানী থেকে শুরু করে সবাই ওদের দূর-দূর করে। সব চেয়ে আশ্চর্য, রূপকথা অন্যত্র। এরা সবাই বিহারের এক বিশেষ অঞ্চলের বাসিন্দা! সেখানে ওদের জীবন ও সত্তা দুজন মহাজনের কাছে বিক্রীত। কলকাতায় পালিয়ে আসা বাঁচবার তাগিদে ও দেশের মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদের খাঁই মেটাতে। কিন্তু ওরা এল বঙ্গে, কপাল এল সঙ্গে। সেই দুজন মহাজনের ছেলে দুজন এখানে এসে ওদের মহাজন হয়ে বসেছে। ফলে পশুচর্ম ট্যান করার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের চামড়াও ট্যান হয়ে চলেছে। কলকাতায় মহাজনের খাঁই মিটিয়ে, দেশে মহাজনের খাঁই মিটিয়ে কলকাতায় ওরা বায়ুভুক হয়ে বেঁচে আছে। এ চক্র থেকে ওদের উদ্ধার করা কারুরই সাধ্য নয়। এসব জানার পর বলবন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করে,

এই নেংটি পরা চামাররা একেকটা সৌরজগৎ বিশেষ। ওদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করে মহাজন-সুদ-বুভুক্ষু ছেলেমেয়ে সব ঘুরছে, ঘুরছে। দেশের মত এখানেও মহাজনদের বাড়ির কাজকর্মে ওদের চাঁদা তুলে দিতে হয়। দেশের মত এখানেও ওরা মহাজনকে যমের মত ভয় পায়। মহাজনরা বড়বাজারের কারবারী।

ওর কথাবার্তা শুনে তখনি বুঝেছিল দেবাদিদেব, বলবন্ত অত্যন্ত দামী জিনিস হাতে পেয়ে গেছে, দামী জিনিস লিখেছে। তখনি তার মনে হয়েছিল, বলবন্ত মরে যাওয়াই ভাল! কেন মনে হয়েছিল?

কাসি থামিয়ে মুখ মুছে বলবন্ত হাঁপাচ্ছিল। কাসিব শব্দটা ভাল লাগেনি দেবাদিদেবের।

কয়েকদিন খোঁজ নিচ্ছি, কোথায় ছিলেন দাদা?

বাইরে।

কনফারেন্স করছিলেন?

হ্যাঁ। লেখক-শিল্পীদের সংগঠন চলছে।

ভদ্দরলোকদের সংগঠন দিয়ে কি হবে? ইন্ ফ্যাক্ট, আপনার-আমার লেখা দিয়েই বা কি হবে? পড়বে তো ভদ্দরলোকেরা?

তুমি ওসব বুঝবে না।

বাঃ দাদা, বাঃ! এমন চটে গেলেন যে "তুমি" বলছেন? তা বলুন, কিন্তু আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আপনিও তো ভদ্দরলোক। খুব ভাল সব লেখা। আপনার, সুকান্তর, সুভাষদার, হয়তো আমারও। আমাকেও তো আপনারা "লেখক" বলছেন। কিন্তু সকলের সব লেখাই মধ্যবিত্ত পাঠক পড়ছে, যে মধ্যবিত্তকে দিয়ে কিছু হবার নয়। মধ্যবিত্ত হাতে-কলমে কোনো উৎপাদনধর্মী কাজ করে না। মধ্যবিত্ত এই সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদক-শোষক-শাসক কোনো ক্যাটেগরিতে পড়ে না। অত্যন্ত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড তার বেঁচে থাকা। সে চাষী নয়, কারখানার মজুর নয়, আমার দেখা চাম-

মজত্বরও নয়। সে এসব কমিটেড লেখা পড়ল কি পড়ল না, তাতে কি এসে যায়? যারা পড়লে কাজ হত, তারা কি পড়ছে?

না।

কেন পড়ছে না?

বলবন্ত যেন কি জেনে ফেলেছিল, কিসে যেন ওকে দুঃসাহসী করেছিল! বলবন্ত হঠাৎ পার্টির নন্দত্বলাল, পার্টির জাত্নধন দেবাদিদেব বসুকে অভিযুক্ত করে বলেছিল, কেন পড়ছে না? কি হবে চাষী-মজুরকে নিয়ে আন্দোলন করে? সঙ্গে-সঙ্গে ওদের লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে না কেন? না শিখলে ওরা নিজেদের হক কি করে বুঝে নেবে? আসলে তা নয়। ভদ্দরলোকরাও গেম্ খেলছে। লীডারশিপ ভদ্দরলোকের হাতে থেকে যাবে, চাষী-মজুর লেখাপড়া না শিখলে।

তুমি কি সব বোঝ?

আপনি বুঝুন তবে। সেটাও তো একটা কাজ, না কি দাদা? হাঁ, বলবন্তটা বোকা বিহারী, ট্রামমজুরের লেখক ছেলে। ওর চিন্তা-ধারায় গণ্ডগোল। ঠিক হ্যায়। তবে বলবন্ত তো আপনাকে "দাদা" বলেছে। ছোটভাইকে না হয় আপনি বুঝিয়ে দিন। বুঝিয়ে দেবেন না? বেশ! তবে নিজে বুঝুন, আর ঠিক-ঠিক কাজ যাতে হয় তা দেখুন। আমি যাই।

কোথায় যাচ্ছ?

বাড়ি যাব। কতদিন যাইনি।

সবটাই তুমি নিজে নিজে করলে। একবার জানালে না কি করছ? পার্টি কি তোমায় বাধা দিত?

কাকে জানাব?

কাগজের আপিসেও খবরটা দিতে পারতে।

কেন দাদা, আমি বলবন্ত বলে? আমিও তো কালচারাল ফ্রন্টের কর্মী—শিল্পী? শিল্পী-লেখকরা তো স্বাধীনভাবেই কাজ

করে। কালচারাল ফ্রন্টে যারা নাটক লিখছে, গান বাঁধছে, তাদের শুধোচ্ছে কেউ ?

এ কথা বললে তো বলা যায় না কিছুই।

কাজ করছিলাম, রিপোর্ট করিনি, ব্যস্।

লেখাটা রেখে যাও।

কেন ?

পড়ে দেখব।

তারপর ?

তারপর জানাব ওটা নিয়ে কি করা যাবে।

নো দাদা।

কেন ?

এটা হেমেনদা পড়েছেন, আর উনিই ছাপছেন, বোম্বে পাঠিয়েও দিয়েছেন। এটা তো প্রথম খসড়া, আপনাকে দেখালাম।

হেমেনকে আগে দেখালে কেন ?

অশোকদা বলল।

অশোক জানল কি করে ?

ও তো জানত আমি কি কাজ করছি। ও-ই তো যেত ওখানে, আমাকে ওষুধ দিত, বস্তির মানুষদেরও ওষুধ দিত।

আমি তো এ সবের কিছুই জানি না।

অশোকদার কাছ থেকেই তো বউদি জানল।

আমি তাও জানি না।

বউদি খুব গ্রেট দাদা ! মেমসাহেব শুধু বাইরে। এ ট্রু মাদার।

বলবন্ত চলে যায়। দেবাদিদেবের বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে থাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব আক্রোশে। অশোকই সব নষ্টের গোড়া। আগে হলে বলবন্ত প্রথম পাণ্ডুলিপি এনে দেবাদিদেবকেই দিত। অশোক দেবাদিদেবকে বিশ্বাস করেনি। সেইজন্যে বলেছে, হেমেনের কাছে লেখা দিতে। হেমেনের হাতে লেখা যাওয়া মানে, তখনি তা

প্রকাশ হবে। প্রকাশ হলে বলবন্তের নাম নিমেষে স্বীকৃতি পাবে বৃহত্তর পাঠকসমাজে। যাচ্ছেতাই ব্যাপার সব! অশোকের কাছে যেতে হচ্ছে এখুনি। অশোক কেন দেবাদিদেবকে উপেক্ষা করতে শেখাচ্ছে বলবন্তকে?

অশোক একা থাকলে দেবাদিদেব কি বলত বলা যায় না। কিন্তু সেখানে বসেছিল হেমেন। হেমেনের ছিল মানুষের গুণ আবিষ্কার করবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। হেমেনই বরুণকে বলত, 'জনযুদ্ধ' বেচবার আরো লোক আছে। যাও, বটুক বা জর্জের কাছে গিয়া পইরা থাকো, অমন গানের গলা তোমার!

বরুণ সে-কথায় প্রভূত আনন্দ পায়। অবশ্যই সে "জনযুদ্ধ" ও "পীপ্‌ল্‌স্‌ ওয়ার" বেচা বন্ধ করেনি, কিন্তু গানও গাইতে থাকে। কয়েকটি গান বড় ভাল গাইত। কায়ুর কমরেডদের ফাঁসির গান:

"ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কায়ুর বন্ধুরে—
মালাবারের কৃষক সন্তান
তারা কৃষকসভার ছিল প্রাণ
বাঁচিয়া রহিবে রে তারা দেশের দশের অন্তরে।"

এ গান প্রখ্যাত গায়করাও গেয়েছে, কিন্তু বরুণ পারত কাঁদিয়ে দিতে। না কি সবই স্মৃতিতে মধুর মনে হয়?

যাহোক, হেমেন ছিল বসে। দেবাদিদেবকে দেখেই ও বলে, লও, দ্রোণ আর একলব্যের কাহিনী রিভার্স হইয়া গেল গিয়া।

কি হল?

একলব্য ইজ গোয়িং টু বিট দ্রোণ।

কি সব বলছ?

আহা, মশকরা করি হে! তুমিও দ্রোণ নও, হেই বলবন্তও একলব্য না। কিন্তু ছেমরা তোমারে গুরুভক্তি করে। অর একখান ব্যাখ্যা যা পাইছি, ছেমরা বহুত উপরে উঠব হে!

জানি, দেখেছি।

হেমেনের কি কোথাও বিশ্বাস ছিল, এইসব গণসাহিত্য-প্রগতি সাহিত্য? এসব আসলে কিচ্ছু হচ্ছে না? নইলে ওর কথায় এত উল্লাস, হিংস্র উল্লাস ছিল কেন সেদিন? এমনিতে তো শান্ত মানুষ—খুব শান্ত। মানুষের পরিচয় মেলা বড়ই কঠিন। হেমেন ১৯৩৮।৪৯-এ রণদিভের লাইনকে কনডেম্ করে। তখনকার সময়টা যেন কি রকম। পার্টির কাডারদের পেছনে পুলিস। কাডাররা আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারে হ্যাণ্ড প্রেসে ছাপানো পার্টি পেপার হাতে পাবার জন্য কি আকুলতা! কে কে গেল পুলিসের গুলিতে। কাতর উৎকণ্ঠা, ব্যাকুল উদ্বেগ। ছবি বেরুলে ধ্যাবড়া ছবি। দেবাদিদেব হেমেনের খবর নিতেই গিয়েছিল। দীপ হঠাৎ ঢুকেছিল একখানা কাগজ হাতে। চোখ খুব যন্ত্রণার্ত। "জানেন? জানেন খবরটা? জানেন না? সবচেয়ে জরুরী খবরটা জানেন না?"

চোখ যেন জ্বলে উঠেছিল দীপের, "আপনারা এক জাতের মানুষ মশায়। পার্টিতে এস্ছিলেন কেন? শুদ্ধ শিল্প, শুদ্ধ সাহিত্য তো করলেই পারতেন? যত্তো সব!"

অসহিষ্ণু হয়ে পড়ত দীপ এই রকম কিছু দেখলে। দেবাদিদেবের তখন মনে হত এটা যেন বাড়াবাড়ি। পার্টি-কমরেডদের মধ্যে কোনো রকম গা-বাঁচানো ভাবভঙ্গি দেখলে দীপ এত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে কেন?

হেমেন বলত, আর্টিস্ট মানুষ।

কিসের আর্টিস্ট?

দেবাদিদেব বুঝতেই পারত না দীপকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় কেন? দু এক বছর বাদে শুনেছিল, ওরা কয়েকজন বহুকষ্টে টাকা জোগাড় করে এবং মাঝে মাঝে স্যুটিং করে। ছবিটির নাম "মানুষ"। গল্প, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা দীপেরই। দেবাদিদেব শুনেছিল, কিন্তু আমল দেয়নি তেমন। ফিল্ম বিষয়ে ওর কোনো আগ্রহ ছিল না ভেতরে। কতকগুলো ব্যাপার চলে সমান্তরাল রেখায়। যেমন,

প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। একেকটি ছবি দেখে বেরিয়ে এসে মনে হত, হ্যাঁ, ফিল্‌ম অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শিল্প-মাধ্যম, কিন্তু এদেশে চলচ্চিত্র কখনো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠবে না। তারপরও হল, "পথের পাঁচালী"—আর সেদিনই "মানুষ" দেখে দেবাদিদেবের হঠাৎ মনে হল, ছবিটা করার সময়ে খুবই তরুণ ছিল দীপ।

দীপকে হেমেন সস্নেহ প্রশ্রয় দিত। সেই রণদিভে-পিরিয়ডে—যোশী-পিরিয়ড, রণদিভে-পিরিয়ড, তারপর আরো আরো পিরিয়ড—একেকটা সময় একেকজনের নামে চিহ্নিত থেকে যায়, সে চিহ্নের মানে একই রকম জরুরী থাকে না আর। সেই রণদিভে-পিরিয়ডে, হেমেনের খবর নিতে ওর বাড়ি ছুটে গিয়েছিল দেবাদিদেব। অতর্কিতে ঢুকে পড়ে দীপ। আখাম্বা ঢ্যাঙা, গায়ে আলোয়ান, হাতে একখানা ধ্যাবড়া ছাপা কাগজ।

"জানেন? জানেন খবরটা? জানেন না? সবচেয়ে জরুরী খবরটা জানেন না?"

ভাবতে গিয়ে মনে হল দেবাদিদেবের, হঠাৎই মনে হল, সবচেয়ে জরুরী খবর সব সময়েই থাকে। যে জন্যে খবরটি "জরুরী" বিশেষণ পায়, সেই ঘটনাটির চরিত্র মোটামুটি একরকম। ১৯৭৬ সালের শেষাশেষি যেমন, প্রেমানন্দের বাড়ি ২৫শে ডিসেম্বরের পার্টিতে যাবে বলে দেবাদিদেব যখন সেজেগুজে বেরুচ্ছিল, তখন তিনটি ছোকরা ওকে এক হতচ্ছাড়া খুদে ম্যাগাজিন দিয়ে গেল। তাতে ১৯৭৬-এর জরুরী সংবাদের তালিকা ছিল, এবং ছোকরাদের রসিকতা-বোধ এমনই বদখত যে, লেখা ছিল: "১৯৭৬ সাল আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষও বটে, এবং বছরের গোড়াতেই উক্ত ব্যাপার সূচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে উগ্রপন্থীদলভুক্ত বলে সন্দেহ করা হয় এমন মহিলাকে গুলি চালনায় নিহত করে। জানুয়ারির জরুরী খবর এটিই। ডিসেম্বরের পয়লা তারিখের জরুরী খবর হল, তেলেঙ্গানাখ্যাত ভূমাইয়া ও গৌড়ের হায়দ্রাবাদ জেলে ফাঁসি। এই দুজনের কেউই

ডস্টয়েভস্কির খবর রাখতেন কিনা জানা যায় না, তথাপি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণদণ্ড মকুবের আর্জি জানাতে গিয়ে সি. আর. পি. সি. জার নিকোলাস কর্তৃক শেষ মুহূর্তে ডস্টয়েভস্কির প্রাণদণ্ড মকুবের কথা জানান ও প্রার্থনা জানান, কেউ যেন এ কথা বলতে না পারে যে ভারতের সভ্রেন ডেমোক্র্যাটিক প্রজাতন্ত্রের চেয়ে জার নিকোলাস অধিক করুণাময় ছিলেন। এটিও জরুরী খবর যে, রাষ্ট্রপতিও ডস্টয়েভস্কির খবর সম্ভবত জানতেন না।"

জরুরী খবরগুলি সাধারণত রাজনীতিক হত্যাকেন্দ্রিক হয়। সেই রণদিভে-পিরিয়ডে, হতভাগা হেমেন আছে, না হরিণবাড়ি গেছে, জানার জন্য দেবাদিদেব যখন হেমেনের বাড়ি যায়, দীপ দিয়ে যায় সেই জরুরী খবর। ধ্যাবড়া ছাপা কাগজ।

সংবাদটি চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে যেন, "লতিকা সেন পুলিসের গুলিতে নিহত।"

নিহত লতিকা সেন, নিঃশেষে নিহত। "না, তিনি মরেন নি" গোছের কথা-টথা আত্মসান্ত্বনামাত্র। মৃত্যু মৃত্যুই। ধ্যাবড়া ছাপা কাগজ বিক্রি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে কলকাতায়। লতিকা সেনের ছোট্ট ছেলে লিখছে মায়ের কথা। বৌবাজার স্ট্রীট গুলিচালনা। সময়টি রক্তাক্ত থাকবে বলেই মনে হয়েছিল তখন। সর্বত্র অ্যাকশান এবং অ্যাকশান। "য়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ।" ক্রুদ্ধ শ্লোগান। বামপন্থী দলগুলির কর্মীরা জেলে, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে; অতুল গুপ্ত হেবিয়াস কর্পাস-এর ভিত্তিতে দলে দলে খালাস না-করা অবধি। কিন্তু লতিকাদি নিহত হন নিঃশেষে। পথে তাঁর রক্তের দাগ ছিল না পরদিনই। স্বাধীনতার পরে পরেই তো। তখনো কাকভোরে কর্পোরেশনের জমাদার পথ ধুয়ে দিত। সে সব কথা এখন সুদূরের স্বপ্ন। এস্‌প্লানেডে রঙিন-রঙিন ঢাউস ট্যাক্সি আর অভিজাত ফিটন গাড়ি, স্বপ্ন যেন।

হেমেন রণদিভে-পিরিয়ডকে কনডেম্ করে। সে বলত, এই

কইরা কিছু হইত না। এই ভায়োলেন্স ঠিক নয়, বোঝ্লা? অহন দরকার গ্রাম্রুটে গিয়া কাম করা।

১৯৭২-এর গোড়াতেই। বরানগর-কাশীপুরের গণহত্যার অনেক আগেই. সেই হেমেনের শবদেহ পাওয়া যায় ময়দানে। ভোরের ময়দানে।

পার্টি ভাগ হবার সময়ে হেমেন দেবাদিদেবের ওপর বাম হয়, এবং বাম হতে বামে চলে যায়। সব কিছুই হেমেন গভীর আন্তরিকতায় করত। এ কাজটিও। এবং অত বাঁ দিকে যারা যাচ্ছে, তাদের পরিণাম কি হবে, তা দেবাদিবের মত কে জানত? অসম্ভব উদ্বিগ্ন হয় দেবাদিদেব হেমেনের জন্য। ছুটে যায় বন্ধুকে বোঝাতে।

হেমেন, এ কিন্তু হিংসার রাজনীতি।

আপইত্য কি?

কি বলছ?

আরে গণতন্ত্রে হকলতি থাকতে পারে। আর এই যদি হিংসার রাজনীতি হয়, তাইলে দেব, বলতে হয়, তোমাগো অহিংসার রাজনীতিই এই পথ লইতে বাধ্য করতেয়াছে।

না হেমেন, এ তুমি ঠিক করছ না।

তুমি ত পুত্লা। যেমুন লাচায় তেমুন লাচ। তুমি যা বলতেয়াছ, হেও অপরের কথা।

আমি তোমার বন্ধু।

তুমি ক্যারো বন্ধু হইতে পার নাই দেব।

হেমেন, কথাটা কি মন থেকে বললে?

বারি যাও দেব।

হেমেন!

দেবাদিদেব হেরে যাচ্ছিল। ওর ওপর নির্দেশ ছিল হেমেনকে বোঝাবার। তা ছাড়াও ছিল আন্তরিক উদ্বেগ। কিন্তু হেমেনের

চারদিকে ছিল অদৃশ্য এবং দুর্ভেদ্য এক চানের প্রাচীরসদৃশ প্রতিরোধ। দেবাদিদেব একদা ট্রাম ধর্মঘট নিয়ে "প্রতিরোধ" নামে একটি উপন্যাস লিখেছিল।

তুমি আমারে কি বুঝাইবা? হিংসার রাজনীতি করি আমরা? আর হেই রাজনীতি দমন করতেয়াছে গরমেন অহিংস উপায়ে? পোলাগুলিরে মারত্যাছে। অন্ধ্রে ত সন্ত্রাসরাজ। জেলে কিলিং চলত্যাছে, এইগুলি হইত্যাছে কি অহিংস উপায়ে?

তুমিত কথা বলতেই দিচ্ছ না।

কওনের নাই কিছু। আমি তোমার মত পার্টির দুলাল নই দেব। আছিলাম কিষাণ ফ্রন্টে, হেয়ার পর কলকাতা, পার্টি ছাড়া কিছু জানি নাই, পার্টি কইরা বিমানযোগে ভ্রমণ করি নাই তোমার মত। বিলাতী মদ খাই নাই। দিল্লীরে শ্বশুরবাড়ি বানাই নাই।

তোমার মত বদলের স্বপক্ষে যুক্তি কি?

তুমি কে, যে তোমারে বলব? "বদল" কিসে? অত্যন্ত লজিকালি স্টেজ বাই স্টেজ আমি এই মতে আসছি।

না, তুমি……

বারি যাও।

থেকেই হেমেন বুঝি আণ্ডারগ্রাউণ্ড।

একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে কলকাতায়। আশ্চর্য, তখন সব গোপন খবরই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জানা যেত। খবরগুলির যেন নিজস্ব শক্তি ছিল। নিজে থেকেই ছড়িয়ে পড়ত। খবরটি এইরকম—"গতকাল মধ্যরাতে মধ্য কলিকাতার ডিঙাডাঙা লেন থেকে পুলিস অনুপম দাশগুপ্ত নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বহু সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের সহিত উক্ত ব্যক্তি…"। "মধ্য" শব্দটির তিনবার ব্যবহার সকলেরই চোখে পড়ে এবং ভোরের কাগজ হাতে পাওয়ার ঘণ্টা তিনেক বাদেই দেবাদিদেবকে গুপী নামক মস্তান বলে যায়, শুনেছেন, হেমেন বাবুকে পুলিস ধরেছে?

অনুপমই হেমেন কি না জানতে ছোটে দেবাদিদেব, এবং দেবকী ব্যানার্জি মোটেই সহযোগিতা করে না। দেবাদিদেবকে পিকাসোর ছবির প্রিন্ট দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হেমেনের বিষয়ে আর কিছুই জানা যায় না বলেই সব জানা হয়ে যায়। হেমেনই গ্রেপ্তার হয়েছে, তাতে সন্দেহ থাকে না আর। দেবাদিদেবের সোদ্বেগ প্রশ্নগুলি বিপুল মিত্র সস্নেহে শোনে এবং বলে, খবর পাই যদি নিশ্চয় জানিয়ে দেব। তারপরই বিপুলের মেসেঞ্জার এক বন্ধ লেফাফা নিয়ে আসে। তাতে থাকে ক্রিকেটের টিকিট একটি, এবং সাদা কাগজে, সে যে বিপুল, সে প্রমাণ না রেখে একটি স্বাক্ষরহীন টাইপ করা রসিকতা—একদা সহপাঠী ছিলে সেই স্মরণে—লাইফ ইজ বাট এ গেম অফ ক্রিকেট! দেবাদিদেব বোঝে, বিপুল বলতে চাইছে, হেমেনের বিষয়ে যে খবরই পাও, খেলোয়াড়সুলভ নির্বোদ গ্রহণ কোরো। দেবাদিদেব নিশ্বাস ফেলে এবং প্যাক-লাঞ্চ নিয়ে চলে যায় ক্রিকেট দেখতে।

শীতের ভোরে ঘটে যায় সেই রূপকথা। উত্তরভারতের যেসব মেষপালকরা ময়দানে ভেড়া চরায়, তারাই হেমেনের দীর্ণ-বিদীর্ণ শরীর পায় ময়দানে। এ সময়ে কলকাতায় বাঁধাকপির মতই গুলি খাওয়া লাশের প্রাদুর্ভাব, তা ভেড়াগুলিও জানে। ভেড়াগুলি ছিটকে সরে যায়, মেষপালকরা পালাতে যায় এবং শোনে এক পুলিসী হাঁকুড়। বাগ্ যাও, বাগ্ যাও—জনৈক গুর্খা পুলিস বলে এবং ওরা পালাতে যেতেই সেই পুলিসই হেঁকড়ে বলে, আরে! বাগ্ যাতা কাহে? এই সময়েই একটি জীপ ঢুকে পড়ে ময়দানে এবং একটি শীর্ণ স্ত্রীলোককে পুলিস হাত ধরে নামায় জীপ থেকে। হেমেনের স্ত্রী হেমেনের লাশটিকে "হেমেন" বলে সনাক্ত করেন। পুলিস এখন নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু লাশটি তারা হেমেনের বউকে দেয় না।

কেন দেবেন না?

পুলিস অফিসার হেসে বলেন, এখন আমরা সিওর হলাম উনিই হেমেনবাবু। কিন্তু অফিসিয়ালি ওটি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ আপনাকে দেব কেন?

দেবেন না কেন?

পুলিস অফিসার ভেবে পান না, না-দেবার লজিক এঁর মাথায় ঢুকছে না কেন। তিনি ভাবতে থাকেন কি বলবেন, এবং হঠাৎ হেমেনের স্ত্রীর কি যেন মনে পড়ে। তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, নখগুলো টেনে তুলে নিয়েছিলেন? নখগুলো? নখ কোথায় ওর?

চেঁচানো আর থামে না। অজ্ঞান হয়ে যান মহিলা এবং লাশ না নিয়েই বাড়ি ফেরেন। সমগ্র ঘটনাটির অবিশ্বাস্যতা সম্পূর্ণ করে একটি সরকারী চিঠি। চিঠিতে লেখা থাকে, জেলে গিয়ে হেমেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য যে আবেদন পাঠিয়েছিলেন মহিলা, তা মঞ্জুর হয়েছে।

এই হেমেন, সেই তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশেও ছিল পার্টির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বলবন্তের বিষয়ে কথা বলতে দেবাদিদেব যখন অশোকের বাড়ি যায়, সেখানে বসেছিল হেমেন। হেমেনের সামনে দেবাদিদেব কিছুই বলতে পারেনি অশোককে। ওদের সংলাপই শুনছিল। সংলাপটি বলবন্তকে নিয়ে।

দেখ অশোক, যা করতে হয় কর। খরচ-খরচা? আমাগো রেড-এইড ফাণ্ড আছে না? পিপ্‌ল্‌স রিলিফ কমিটিও আছে। ছ্যামরারে বাঁচাইতে অইব। দিন পাইলে মস্কো পাঠাইয়া সারাইয়া আনুম।

করব সব।

হকল পরীক্ষা কইর‍্যা নিও।

নেব।

পুষ্টিকর খাদ্য দরকার।

সবচেয়ে আগে দরকার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আমি ডিস্‌পোজাল থেকে মাখন, দুধের গুঁড়ো, ডিমের গুঁড়ো দিয়েছি ওকে।

বাসায় ত নাই কেউ।

দশরথজী করে দেবেন।

হাসপাতালের বেবস্থা ?

চেষ্টা করছে অনেকে।

অসম্ভব সন্দেহ জমে দেবাদিদেবের মনে। বলে, হেমেন, অশোক, তোমরা বলবন্তের কথা বলছ ?

হ দেব।

বলবন্তের কি হয়েছে ?

কেন ?

বলছ না।

টি. বি. বলে সন্দেহ হচ্ছে···অশোক বলে।

টি. বি. ?

হেমেন বলে, হ। অরে ছুটি দিতে হইব, চিকিৎসা করাইতে হইব, নইলে বাঁচবো না।

সত্যিই টি. বি. ভাবছ, অশোক ?

হ্যাঁ।

তুমি ডাক্তার, অশোক ?

দেবাদিদেবের গলার নগ্ন হিংস্রতায় হেমেনও অবাক হয়। বলে, দেব, আমার বারি এইটা। ঝগরা কইর না।

রাখো তোমার বাড়ি। অশোক একটা জানোয়ার। টি. বি. মনে করছে, অথচ আমায় কিছু বলেনি।

তোমাকে বলব কেন ?

তোমাকে বলবে ক্যান্ ?

বলবন্ত আমার বাড়ি যাচ্ছে, আমার ছেলেটা বাচ্চা···

আমি তাকে যেতে বলিনি, আমি জানি না সে যায়।

তবে তাকেই বলো তার রোগটা কি ?

না। অশোক অত্যন্ত কঠিন গলায় বলেছিল, যে কোন কারণ

দেখিয়ে অথবা না দেখিয়ে তোমার বাড়ি থেকে ওকে বের করে দাও। কিন্তু ওকে কখনো বলবে না, ওর কি রোগ সন্দেহ করছি।

কেন?

কেন না, "যক্ষ্মা" নামটা ওর মন ভেঙে দেবে। ওর ওরিয়েনটেশনে যক্ষ্মা মানেই মৃত্যু। ওর বাঁচার ইচ্ছা ও সহযোগিতা আমার দরকার। কেননা, ওর বাঁচা দরকার।

বাঃ! চমৎকার যুক্তি।

হেমেন বলেছিল, তুমি আস গিয়া।

অশোক বলেছিল, এখনো এক্সরে হয়নি, স্পুটাম পরীক্ষা হয়নি, এখনো বলা যায় না রোগটা কি!

তুমি একটা, একটা জানোয়ার অশোক।

বাড়ি ফিরে দেবাদিদেব ঈপ্সিতাকে গাল পাড়তে থাকে। বলতে থাকে, বলবন্ত! ওকে নিয়ে ন্যাকামি করতে হলে বাইরে কোরো। জানো, ওর যক্ষ্মা হয়েছে?

যক্ষ্মা! জঘন্য অসুখ?

হ্যাঁ। ওকে সোহাগ দেখাতে গিয়ে আমার ছেলের জীবন বিপন্ন করবে তা হতে দেব না।

বলবন্তকে সারিয়ে তুলবে বলে অশোক দাঁতে দাঁত চিপে লড়ে যায়। দশরথের ঘরও তেমন ভাল নয়। তবে বড়সড়। টানা দালানের পর সার-সার ঘর। অন্যান্য ট্রামকর্মীরাও বলবন্তকে ভালবাসে খুব। বই লিখে বাচ্চু ওদের মান বাড়িয়ে দিয়েছে। মায়েরা ঠেঙিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠায়। কর্পোরেশন স্কুল। বলবন্ত পেরেছে, তোরাও পারবি।

অশোক বলবন্তের বুকের ছবি তোলে, থুথু পরীক্ষা করায়। তখনো সর্বরোগহর অ্যান্টিবায়োটিক আসেনি। ইঞ্জেকশন চলে, ওষুধও। দশরথকে বলে, এর পর হাসপাতালে দেব।

কি হয়ে গেল ওর? খোঁখী রোগ, না?

আপনি তো সবই বুঝেছেন।

দশরথ অসীম বিশ্বাসে বলে, হাসপাতালে গেলেই সেরে যাবে। ওর জানের জন্যে ভাবি না আমি গণক বলেছে, ও সত্তর বছর বাঁচবে।

বলবন্তকে দেখতে পার্টির লোকজন হরদম আসত। ছাপা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে "ফ্রম দ্য লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স" নিয়ে কলকাতা মেতে উঠেছিল। বলবন্তকে চাই, বলবন্ত! খাঁটি শ্রমিক ঘরের ছেলে এখন জীবিত তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতি ওর মধ্যে। অশোক রোজ যেত। আর ওর বাড়িতে আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে দেবাদিদেবও নিশ্চিন্ত হয়। বলে, সেদিন হঠাৎ চেঁচামেচি করে ফেললাম অশোক!

ঠিক আছে।

কেমন আছে ছেলেটা?

এখন তো ভালই থাকার কথা। কিন্তু···

কিন্তু কি?

হাসপাতালে সীট হয়ে যাবে শীঘ্রই। হাসপাতালে বছর খানেক থাকলে ভাল হয়ে যাবে।

খুব ছোঁয়াচে রোগ, তাই না?

আমি রোজ যাই, অনেকেই যায়। বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে, কার্বলিকে হাত-পা ধুয়ে ফেললেই হল।

শীতও পড়েছে দুর্জয়।

তুমি না কোথায় যাচ্ছ?

হ্যাঁ, যেতে পারি।

একই সঙ্গে হাড়কাঁপানো শীত পড়ে। দেবাদিদেবের চট্টগ্রাম যাওয়ার ব্যাপার ঠিক হয়ে যায়। ধানবাদ কলিয়ারিতে আগুন লাগে মিথেন থেকে। শ্রমিকে-মালিকে বাধে গোলমাল, দেবাদিদেব যায় বলবন্তের বাড়ি। বলবন্ত বসতে বলে। সে বলবন্তের থেকে অনেক

দূরে বসে ধানবাদ কলিয়ারি নিয়ে বিস্তারিত গল্প করে। যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে মিত্রশক্তির জেতা চাই। যুদ্ধের দরুণ কয়লা চাই। মজুররা রাতে দিনে কয়লা কাটছে, কিন্তু ঠিকমত মজুরী পাচ্ছে না তারপর আগুন লেগে, গ্যাসে দম আটকে, ধস চাপা পড়ে মরছে তো মরছেই। কি দুঃখ, যে এই সবকিছু লেখায় ধরতে পারে, সে পড়ে আছে আজ।

ম্যায় যাউঙ্গা।

না-না, তা কি হয়?

দশরথ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলেছিল, এসব কথা শোনাবেন না ওকে। আগে সেরে উঠুক, তখন ও সব কাজ করবে।

আমিও তাই চাই। ওকে সেরে উঠতেই হবে।

তারপর দেবাদিদেব এমিল জোলার গল্প করে। কয়লাখনিতে গিয়ে সে লোকটা "জার্মিনাল" লিখেছিল। ভ্যান গগ? সেও তো গিয়েছিল কয়লাখনিতে। ছবি আঁকতে। বলবন্ত গেলে একই সঙ্গে জোলা ও ভ্যান গগের কাজ হত। সে লিখতে পারে, ছবিও আঁকতে পারে। কিন্তু না, বলবন্ত সেরে উঠুক আগে। বলবন্ত কথাগুলো শুনতে শুনতেই দেবাদিদেবের স্কেচ করে ফেলে। তারপর কাশতে শুরু করে। দশরথ সস্নেহে বলে, শো যা লাল!—বলবন্ত ফর্সা নেকড়ায় মুছে কার্বলিক জলের গামলায় ফেলে, জল লাল হয়।

দশরথ দেবাদিদেবকে এগিয়ে দিয়ে যায় গলির মুখ অবধি। দেবাদিদেব অন্যমনস্ক, গম্ভীর। দশরথ ধরে নেয়, বলবন্তের জন্যে চিন্তিত ও। বলে, কাশিতে রক্ত দেখে চিন্তা করবেন না।

করব না?

অশোক তো বলছে সেরে যাবে লাল। তবে বিশ্রাম নিতে হবে। হাসপাতালে ভি নেবে ওকে। আমি বললাম, দরকার হলে পয়সা দিব বেডের জন্যে। কামাই করছি, সে তো ওরই জন্যে। ঔর আমি তো একেলা ভি নই, পার্টি আছে না?

বলবন্ত কি দারুণ লিখেছে বইটা !

প্রবীণ ইউনিয়ন কর্মী দশরথ ঝা সহজাত আভিজাত্যে বলে, মজদুরের ছেলে ও, ওহি তো লিখবে চাষ-মজদুরের কথা, নাকি তোমরা লিখবে কমরেড ? মজদুর জানে মজদুরের দুখ।

দেবাদিদেব চলে এসেছিল। চলে গিয়েছিল চট্টগ্রাম। প্রবীণ কবিয়ালকে দেখতে, গান লিখে নিতে। বলবন্ত বাবাকে লুকিয়ে, কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিল ধানবাদ।

শীতকাল। বৃষ্টি পড়ছিল। গরম জামা ওর তেমন ছিল না। বাবার ট্রাম কোম্পানির অলেস্টার। দেবাদিদেবের স্কেচটা গুটিয়ে রেখে গিয়েছিল। অসম্ভব রোমান্টিকতায়. বিশ বছরের উচ্ছ্বাসে, নিজের কাসির রক্ত দিয়ে তুলিতে লিখে দিয়েছিল 'মাই মাস্টার, অ্যাজ আই সী হিম'। ছবিটা পরে ওকে দেওয়া হয়। আজকাল সেই ছবিটাই সকল ফ্রি ওআর্লড-ভুক্ত দেশে ছাপা হয় ওর বইয়ের পিছনের মলাটে। বলবন্ত ঠাণ্ডা লেগে, যক্ষার ওপর নিউমোনিয়া হয়ে ধানবাদ হাসপাতালে মরে গিয়েছিল। স্মৃতিসভায় দেবাদিদেব কেঁদে বলেছিল, কেন ও ধানবাদ গেল ? কেন ? কেন ?—স্মৃতিসভায় দশরথ ছিল না। জন্মের ও রক্তের সংস্কার। ও ধানবাদ থেকে বলবন্তের অস্থি নিয়ে গয়া জেলায় নেরুন্দা গ্রামে ফল্গু নদীতে ফেলতে গিয়েছিল। ওর সাতপুরুষের অস্থি ফল্গুতে ফেলা হয়েছে।

অশোক ওকে স্মৃতিসভার পর বলেছিল. তুমি একটা মন্‌স্টার দেব। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।

ঈপ্সিতা বলেছিল, তুমিই ওকে মেরে ফেলেছ। ও অশোককে লিখে গিয়েছে, দাদা আমায় পথ দেখিয়েছেন।...ঈপ্সিতা কেঁদেছিল। ভীষণ কেঁদেছিল।

তার ঠিক ন'মাস পরে মেজ ছেলে জন্মায়। অশোক ওর জীবনে আর আসেনি। নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিল। ঈপ্সিতা বলেছিল, তোমার বয়স তিরিশের কোঠায় হলে কি হয়, তুমি

ইয়ংদের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকবে বলে ঠিক করেছ। এ কি করলে! জেনে শুনে···বলবন্তকে···তুমি নিজে গেলে না কেন? কেন চট্টগ্রাম পালিয়ে গেলে? কেন?—ও বলেছিল, কি বলেছিল? তখন কি ঈপ্সিতার সঙ্গে কথা বলার সময়? তখন বলবন্তের বিষয়ে সমানে লিখতে হচ্ছে। বলবন্তের কথা ওর মত কে জানে? যুক্ত বঙ্গের যেখান থেকে ডাকছে, স্মৃতিসভায় যেতে হচ্ছে।

রোদ তাতছে। সূর্য জ্বলছে। ডেইজির পাপড়ি নুয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, সেই হল শুরু। সেদিন থেকেই ও ঘর ছেড়েছে। কিন্তু সব কথা ও স্বীকার করে যাবে।

দুপুরে ডালহৌসি থেকে লোক এসেছিল ঈপ্সিতার টেলিগ্রাম নিয়ে। এখনি এসো। জরুরী দরকার। তোমার ঈপ্সিতা।

চার

কালাটোপ থেকে ডালহৌসি। এবার হেঁটে ফেরা। পথ সুন্দর। দু'ঘণ্টাতেই পৌঁছে যাওয়া গেল। ডালহৌসিতে ট্যুরিস্ট লজ। পরদিন প্রথম বাসে পাঠানকোট। পাঠানকোটে এসে কি সৌভাগ্য, কলকাতার টিকিট পাওয়া গেল। এখন টিকিট পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু এক ভদ্রলোক রিজার্ভেশান টিকিট বেচে দিলেন, কাশ্মীর যাবেন।

দেবাদিদেব স্টেশনেই থেকে গেল। পাঠানকোটে অত্যন্ত গরম। লু চলছিল। বাতাসে ধুলো যত, আগুন তত। স্টেশনে বসে থাকাই বুদ্ধির কাজ।

যে ভদ্রলোক টিকিট বেচলেন, তিনি কথা বলতে চাইছিলেন। দেবাদিদেব শুনে যাচ্ছিল।

ফ্যামিলি নিয়ে এসেছিলাম।

ও।

ভেবেছিলাম ডালহৌসি খুব ভাল লাগবে, থেকে যাব পনেরো দিন। কাশ্মীর এ যাত্রায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।

ও!

ডালহৌসি আমাদের জঘন্য লাগল। তাই টিকিট বেচে কাশ্মীর যাচ্ছি।

তাই বুঝি।

আপনি কাশ্মীর গেছেন?

অনেক আগে।

ভদ্রলোকের স্ত্রী এগিয়ে এলেন। নমস্কার করলেন। বললেন, আপনার 'ঝিলমে বসন্ত' উপন্যাসটা কাশ্মীরের ওপর লেখা।

হ্যাঁ।

উনি বই-টই পড়েন না। আমি ঠিকই চিনেছি!

ও, আচ্ছা!

ওগো, ইনি দেবাদিদের বন্ধু।

তাই নাকি!

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

মহিলা রীতিমত উত্তেজিত।...দাঁড়াও, শীলাকে ডাকি। শীলা, ও শীলা! শীলা আমার বন্ধু। জিওলজিস্ট।

'শীলা' বলে ডাকতে একটি লম্বা, বছর তিরিশের মেয়ে এগিয়ে এল। বলল, আপনাকে আমি চিনি।

কোথাও কি দেখা হয়েছিল?

'অদ্ভুত, আশ্চর্য!' ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন; 'আপনাকে আমি চিনি!' ছেলেটি বলল। 'কোথাও কি দেখা হয়েছিল?' মেয়েটি বলল। ঠিক এই ভাবে আপনি 'ঝিলমে বসন্ত' উপন্যাসটা শুরু করেছিলেন।

মনে রয়েছে তো আপনার?

স্বস্তি, বিরাট স্বস্তি। এদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। এরা ওকে ডিসমিস করে দিচ্ছে না। তবে কি দেবাদিদেবের

মনে মনে ঘরে-ফেরা শুরু হয়ে গেছে? সেই জন্যেই ওর শরীর, চেহারা ও ব্যক্তিত্ব থেকে সেই অজানা অচেনা রেডিয়েশন চলছে না এখন। যে রেডিয়েশনের অদৃশ্য উপস্থিতি টের পেয়ে অচেনা মানুষ বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। যে রেডিয়েশন সবাইকে ওর শত্রু করে ফেলে। সবাই ওকে শত্রু মনে করছে বুঝলেই দেবাদিদেব আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকে। ভয় হয়, বিষম ভয় হয়।

বড় ভয়। চোখে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসের অভাব। মনে হয়, যে কোন মুহূর্তে বাজারের মাছওয়ালা বলে বসবে, পয়সা ফেরত নিন, মাছ দিয়ে দিন মশাই। সবাই যাকে ডিসমিস করে দিয়েছে তেমন মানুষকে আমি মাছ বেচি না।

বড় ভয় হয়। মনে হয়, এ যেন হিটলারের জার্মানী। দেবাদিদেব ছাড়া আর সবাই গেস্টাপো। সবাই ওকে তাড়া করছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে। সতর্ক শিকারী চোখে লক্ষ্য করছে, কখন ও ফাঁস করে দেয়, ও ইহুদী।

মনে হয়, যে কোন দিন, তাকে, সম্মানিত ও সৎ দেবাদিদেবকে, অসম্মানীয় ও অসৎ বলে কেউ গাড়ি থামিয়ে গায়ে কাশ ফেলবে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে চশমা। চশমা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে কোন তরুণ। বাস-স্টপে বাস এলে ওর টেরি-শার্টে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দিয়ে বাসে উঠে পড়বে কেউ।

কিন্তু এদের চোখে কোন শত্রুতা নেই। এরা ওর পাঠক। ওকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে বিচার করে না। কাগজে যাদের নাম দেখে রোজ-রোজ, মনে করে তারাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

এরা খুঁটিয়ে হিসেব মেলাতে বসে না। দেশ ও মানুষ যখন যন্ত্রণায় মরছে, তখন সে উদ্দাম কলরব না শুনে কেউ গিয়ে বসল স্বপ্নচূড়ার ওপর, কেউ লিখল এস্কেপ-সাহিত্য।

এরা ভাবতে যায় না, দেশ বলতে যখন দুর্ভিক্ষ-বেঠবেগারী-হরিজন বধ, দুর্দশা, উপবাস ও বেইমানী, তখন দেবাদিদেব কেমন

করে যৌনতা, ব্যভিচার, অস্বাভাবিক রক্ত সম্পর্ক—নীরক্ত বামপন্থী কর্মকাণ্ড নিয়ে শিল্পিত গল্প লেখে।

কেননা এরাও এস্কেপ খোঁজে। দেশ ও মানুষ মরে হেজে গেলে এদের কিছু এসে যায় না। আহা, জেলে ক'টা গুণ্ডা মস্তান মরেছে তো কী হয়েছে? এরা নিজেদের সুখী-সুখী জীবনের বৃত্তে কাণামাছি ভোঁ-ভোঁ খেলতেই ভালবাসে। দেবাদিদেবের সেই বন্ধুপত্নীর কথা—কি হয়েছে, অমুক জায়গায় অত ছেলে মরেছে তাতে? এখন তো আমরা সেকেণ্ড শো-এ সিনেমা দেখে পাড়ায় ফিরতে পারছি বাবা!

এরাই দেবাদিদেবের ভরসা, অন্ন, আশ্রয়। কিন্তু শুধু এদের শ্রদ্ধায় তো হবে না। আরো শ্রদ্ধা চাই, যাদের শ্রদ্ধায় লেখক দাঁড়ায়, বাঁচে, টিকে থাকে। সেই সব বিচারশীল, ন্যায়নিষ্ঠ, প্রজ্জ্বলন্ত বিবেকী যুবকদের শ্রদ্ধা চাই। ঘরে ফিরছে দেবাদিদেব। ঘরে ফিরলে ও সব পাবে। ঈপ্সিতার আনুগত্য। ঈপ্সিতার মনে হবে না, ওর সমস্ত বিবাহিত জীবনটা একটা অপচয়।

মেয়েটি কি বলছে যেন!

আমাকে কিছু বললেন?

হাঁ। আমি আপনাকে চিনি। মানে, আমার মার কাছে আপনার গল্প খুব শুনেছি।

আপনার মা? কি নাম?

আপনি চিনবেন না। মার ছোট বোন, আমার ছোট মাসি ছিলেন উজ্জ্বলা দত্ত। আপনি তাঁর ওপর একটা সুন্দর ছোট্ট বই লিখেছিলেন। এবার চিনেছেন?

ভীষণ, ভীষণ আঘাত। ভেতরে কি যেন দীর্ণ হয়ে গেল। মনে হল, এখনি মেয়েটিকে পিষে ফেলে দু'হাতে শেষ করে দেয়, মেরে ফেলে। একবার, যৌবনে, অনৈচ্ছিক পেশীর প্রভাবে নিজের বিশাল চেটোয় পিষে ফেলেছিল একটা চড়াই পাখি।

উজ্জ্বলা দত্ত! দেবাদিদেবের ভেতরে বোমা ফাটল। অন্ধকার হয়ে গেল সব ধোঁয়ায়...বোমার ধোঁয়ায়। তারপর দেবাদিদেব দেখতে পেল রক্তাক্ত পিঠে শুয়ে আছে উজ্জ্বলা বউদি। উজ্জ্বলা বউদি এখন, মৃত্যুর তেত্রিশ বছর বাদে উঠে বসল। দেবাদিদেবের দিকে দুই চোখ; উজ্জ্বলা বউদি আশ্চর্য মায়াবী চোখ তুলে প্রশ্ন করল, শুধু বলবন্তকে দিয়ে ঘরে ফিরতে পারবি? আমার কথা মনে করবি না? আমিও তো তোর ফেরার পথে তোরই হাতে বোনা আরেকটা কাঁটা।

দেবাদিদেব মেয়েটির দিকে যন্ত্রণার্ত, আহত চোখে চাইল। এখনো ওদের চোখে প্রশংসা, মুগ্ধ প্রশংসা। কিন্তু দেবাদিদেবের ভেতর থেকে প্রত্যাখ্যান আসছে। না, চায় না ও ওদের প্রশংসা। মেয়েটি দেবাদিদেবকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে।

মনে পড়ছে, দেবাদিদেব যান্ত্রিক গলায় বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি একটু আসছি।

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল দেখে ওরা একটু অবাক। দেবাদিদেব এগিয়ে গেল। বেঞ্চিতে জায়গা নেই। খবরের কাগজ পেতে স্টেশনের মেঝেতে বসল। মাথা রাখল দু' হাঁটুর উপর।

উজ্জ্বলা বউদি!

সেটা কোন্ সাল হবে? বিয়াল্লিশ, বিয়াল্লিশ, বিয়াল্লিশ! মনে আছে সকালেই দেবাদিদেব বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন সকাল থেকে পেছনে সত্য বিশ্বাস ঘুরত। লোকটা পাকা, ব্রিটিশ আমলার হাতে ট্রেনিং। কি ট্রামে, কি বাসে, কোনদিন দেবাদিদেব ওর পেছু নেওয়া সরাতে পারেনি!

সেদিন দেখা হয়েছিল। আজকাল লোকটা সকালে বিকেলে লেকে হাঁটে। সেদিন লেকেই দেখা।

কি মিস্টার বোস ভাল আছেন?

আপনি।

আহা, চিনেছেন, চিনেছেন তাহলে! আপনি তো কারো মুখ ভোলেন না, সবাই বলে।

ও, আপনি! কেমন আছেন?

যেমন রেখেছেন।

আমি আপনাকে রাখব, তবে আপনি থাকবেন? বলেন কি মশাই! এযে আরব্যোপন্যাস হয়ে গেল।

আহা, আপনারা!

আচ্ছা, চলি।

যাবেন, যাবেন। যাবে তো মশাই সবাই, আমিও যাব। লেকে কি কেউ থাকতে আসে? আমি রিটায়ার করেছি অনেকদিন। আপনি তো এখন ফেমাস লোক। ছেলেদের বলি, ওই দেবতুল্য লোকটাকে আমি ফলো করতাম একদিন। ব্রিটিশ আমলে। হতচ্ছাড়া চাকরি। কি বলেন? ছেলেদের ও কাজে দিইনি। তারা আপনার বেজায় ভক্ত মশাই।

আচ্ছা।

সেই বাড়িতেই আছেন? পুরনো-ঝুরনো যেমনই হোক, পঞ্চাশ টাকায় অমন বাড়ি! হাজার হলেও দোতলা বাড়ি, সবটা আপনার?

সব খবরই তো রাখেন। রিটায়ার করেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না? আমার বাস এসেছে. চলি।

হ্যাঁ। আবার দেখা হবে।

আশ্চর্য লোকটা যাহোক। দেবাদিদেব যে ওকে কাটিয়ে বাসে উঠে পড়ল, তাতে একটুও অপমানিত বা বিচলিত হল না। ও যদি দেবাদিদেবকে কাটিয়ে উঠে পড়ত বাসে, দেবাদিদেবের আঙুলে কাঁপুনি শুরু হয়ে যেত। লোকটা একটা থলি তুলে দেখিয়ে কি যেন বলল হেসে। বোধহয় বাজার করে ফিরবে, তাই বলল। লোকটার নাকে আঁচিল। এ রকম চোখে-পড়া চেহারা নিয়েও দাপটে সাদাপোশাকী কাজ করে চলে গেল।

সেটা বিয়াল্লিশ সাল। হাঁ, বিয়াল্লিশ। মণি প্রামাণিককে 'বাংলার কৃষক' কাগজে কাজ করার সময় থেকেই চিনত দেবাদিদেব। কৃষক ফ্রন্টের পাকা কর্মী, কট্টর কংগ্রেসী। পরে মত ও পথ বদলেছিল বটে, কিন্তু বিয়াল্লিশে মণি প্রামাণিক কংগ্রেস কর্মী, আণ্ডারগ্রাউণ্ড। বাবুদের বিশ্বাস করত না। কথায় কথায় বলত, এই করে কিস্‌সু হবে না।

বিয়াল্লিশে দেবাদিদেবের পেটে আল্‌সার। ঘা হয়ে গিয়েছিল সব। তখন ও বাড়িতে। আলু সেদ্ধ, ঠাণ্ডা ভাত, মাখন, ঠাণ্ডা দুধ খায়। বাড়িতে বাপ আর ছেলে, তৃতীয় লোক নেই। ঠিকে ঝি কাজ করে চলে যায়, বামুনদি রেঁধে দিয়ে যায়। পুরনো চাকর গোলক মেদিনীপুরের লোক। মেদিনীপুরের অবস্থা খুব অশান্ত। বিশেষ গোলোকের স্ব-মহকুমা তমলুকে তখন স্বাধীন রাজ। গোলোক দেশে চলে গিয়েছিল। পরে দেবাদিদেব শুনেছে, ওর বাপ, কাকা দুজনেই গুলি খেয়ে মরে। গোলোকের মা-কাকীমা স্বাধীনতার পর যাবজ্জীবন পেনশন পেয়েছিল।

বিয়াল্লিশের সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত, বিক্ষুব্ধ সময়ে দেবাদিদেবের বাড়ি খালিই থাকত। চিলেকোঠার ঘর। সেখানে মেঝেতে শুয়ে জানালার খড়খড়ি দিয়ে চেয়ে থাকলে রাস্তা সটান চোখে পড়ত। সন্ধ্যা থেকে কলকাতা নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারে যেতে-আসতে সুবিধে ছিল। সত্য বিশ্বাস, মণিবাবুর কথা জানত কি না কে জানে? কিন্তু দেবাদিদেবের পেছনে ও ব্রণের মত এঁটে থাকত।

মণিবাবু পলাতক, আণ্ডারগ্রাউণ্ড। বিয়াল্লিশের শেষে ও ধরা পড়ে। দেবাদিদেব উজ্জ্বলা বউদির কাছে বিয়াল্লিশের আগস্ট থেকে ঘন ঘন যেত। দেখাশোনা করত। মণিবাবু একবার বললে উজ্জ্বলা বউদি ওর সঙ্গে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতেও রাজী ছিল···লাইন ওপড়াতে, টেলিগ্রাফের তার কাটতেও রাজী ছিল। মণিবাবু বলেছিল, ঘর ধরে বসে থাক। তাই উজ্জ্বলা বউদি ঘর ধরে বসে ছিল। মণিবাবুই ওর জীবনে সব। মণিবাবুর ছন্নছাড়া জীবনের ভাগ নেবে বলে ও

সচ্ছন্দে ছেলেমেয়েদের বাপ-মা'র কাছে রেখে কলকাতায় ভবানীপুরে, এক এঁদো গলিতে একটি বারাক-বাড়ির একতলায় দু-খানা ঘরে বাস করত।

সে ঘরে রোদ ঢুকত না। ঘরটি উজ্জ্বল ও আলোকিত করে রাখত উজ্জ্বলা বউদির আশ্চর্য-আশ্চর্য হাসি। মণিবাবু বাইরে-বাইরে ঘুরত। ওর জেলার কর্মীরা কলকাতায় এলে যখন-তখন মণিবাবুর বাড়িতেই উঠত। উজ্জ্বলা বউদি সকলের জন্যে ভাত রাঁধত, চা করত। ওদের কর্পোরেশনের কল। সব সময়ে জল থাকত না কলে। উজ্জ্বলা বউদি বলতো, ভাত বসিয়েছি, দেখো তো দেবু। বলে, জল ভরতে উঠোনে নেমে যেত। বালতি বোঝাই জল টেনে এনে-এনে বউদি ড্রাম-টিন-কলসি-জালা ভরে রাখত। বলত, এদের বিশ্বাস আছে? হয়তো বে-টাইমে এসে বলবে, স্নান করব।

কোন শখ বা শৌখিনতা ছিল না উজ্জ্বলা বউদির। শুধু সাবান ঘষে-ঘষে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করতে ভালবাসত।

বৌদির স্বভাবটি ছিল শান্ত, সহিষ্ণু, আনন্দে ঝলমল করত সর্বদা। এত আনন্দের উৎস, তবু কেন যে খেঁকি তিড়বিড়ে মণিবাবু, ভাবলে পরে দেবাদিদেবের অবাক লাগত। মণিবাবু বলত, তুমি অরে হাসতেই দ্যাখ দেবু, ম্যাজাজ তো দ্যাখ নাই। ম্যাজাজ কি!

বউদি হাসত। হাসলে ওর চোখ দুটোও হাসত। গভীর কালো চোখ নেচে উঠত, যেন গভীর পুকুরের কালো জলের নিচে থেকে ঠেলে উঠল তরঙ্গ। চোখের পাতা নেমে আসত। ঈষৎ আয়ত ফোলা চোখের ঘন ও কালো চোখের পাতা। মনে হত, তুলিতে আঁকা। ওই চোখ দুটি ছাড়া উজ্জ্বলা বউদির চেহারায় কিছুই ছিল না। শীর্ণ, কালো, ছিপছিপে গড়ন, গায়ে গলায় কুঁচি দেয়া শেমিজ, পরনে চটের মত খদ্দরের শাড়ি। শেমিজটা কখনো ছাই-রঙা। বর্ষার দিনে বউদি রান্নাঘরে দড়ি টাঙিয়ে উনোনের তাতে কাপড়-সেমিজ মেলত। নইলে অত মোটা জিনিস শুকোত না।

মণিবাবু বলতেন, ওই চক্ষু দেখাইয়া ভুলাইছিল।

কাকে? তোমাকে?

আমার পিসারে।

মণিবাবুর অভিভাবক ছিলেন ওঁর পিসেমশাই। বিয়েটা ওঁরই দেওয়া। বউদির বাবার অবস্থা ভাল ছিল বলে দেবাদিদেব জেনেছিল। মণিবাবুর সঙ্গে কি দেখে বউদিকে বিয়ে দিয়েছিল ভদ্রলোক, তা ভেবে পেত না। বউদির সঙ্গে ও গল্প করত রান্নাঘরে বসে। উজ্জ্বলা বউদি ঈপ্সিতার মত লেখাপড়া জানত না, বীণার মত গান গাইতে পারত না। রান্না ছাড়া কিছুই জানত না বলা চলে। রাজনীতির ল-ব-ড জ্ঞানও ছিল না। মণিবাবু যা করে ও তাতেই বিশ্বাস করত।

সেইজন্যেই ও কর্মীদের জন্যে ভাত রাঁধত, যে আসত থাকতে দিত। মাঝে-মধ্যে সমিতি করতেও যেত। কোন কষ্টেই পেছপাও হত না উজ্জ্বলা বউদি। কেননা মণিবাবুর মত ও নিজেও বিশ্বাস করত, অহিংস সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা এল বলে। মণিবাবুর মত ও নিজেও বিশ্বাস করত বলা বোধহয় ঠিক নয়। মণিবাবু বিশ্বাস করত, অতএব ও-ও বিশ্বাস করত বলাই ঠিক। উজ্জ্বলা বউদির নিজের চিন্তা ও বিশ্বাস করার কোন ক্ষমতাই ছিল না।

তখন কি মানুষ খুব বিশ্বাসী ছিল? দেবাদিদেবরা বিয়াল্লিশে না হোক তেতাল্লিশ থেকে বিশ্বাস করত বিপ্লব এসে গেছে। মণিবাবু বিয়াল্লিশে সংযোগ-ব্যবস্থা বিকল, লাইন-ওপড়ানো, এই সব কাজ করছিল, এবং মাঝে মাঝে দেবাদিদেবের বাড়ির চিলেকোঠার মেঝেতে শুয়ে-শুয়ে বলছিল, বুঝলা দেবু! এই সব মেজার ফর দি টাইম বিয়িং। অহিংস সংগ্রামের পথেই আলটিমেটলি স্বাধীনতা আইয়া পরব। দেবাদিদেবের নিশ্চয় মণিবাবুর মতে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু পরস্পর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে তাতে অসুবিধা হত না। মণিবাবু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, উজ্জ্বলা বউদি একা, দেবাদিদেব পেটের

আলসারে বাড়িতে-বসা, দেবাদিদেব বউদিকে খুবই দেখাশোনা করত। বউদিকে অসম্ভব ভালবাসত দেবাদিদেব। আজ মনে হয়, বউদি একমাত্র মেয়ে যাকে ও সত্যি শ্রদ্ধা করত।

দেবাদিদেবের সাহিত্য-প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, এসবের কোন দামই ছিল না বউদির চোখে। পুরুষ হিসাবে দেবাদিদেব যে খুব আকর্ষণীয়, তাও ওর কাছে মূল্যহীন। মণিবাবু ছাড়া আর কোন পুরুষকেই ও পুরুষ মনে করত না। তা ছাড়া আগস্ট-বিপ্লবের সময়ে দেবাদিদেব বিশেষ করে বুঝেছিল, মণিবাবু সংক্রান্ত সব কিছু ওর কাছে অতি পবিত্র। একদিনের কথা মনে পড়ে। একটা বড় মোটা তুলি দেয়ালের কুলঙ্গিতে। দেবাদিদেব তার ডাঁটি দিয়ে পিঠ চুলকেছিল। বউদি ছোঁ মেরে নিয়ে নিয়েছিল তুলিটা। একটা হাতপাখা দিয়ে বলেছিল, এর ডাঁটি দিয়ে পিঠ চুলকোও।

-ওটাই তো ভাল।

না বাবু। ঘড ছাড়ার আগে তোমার দাদা ওই তুলি আমাকে দিয়ে গেল। বলল, টুনি! ইংরেজ! ভারত ছাড়ো! কুইট ইণ্ডিয়া! নেতাদের মুক্তি চাই! এই শ্লোগানগুলো আমি ডবল লাইনে লিখে দিয়ে গেলাম। তুমি আলতা দিয়ে ভরিয়ে দিও ফাঁকগুলো। ওটা আমি তুলে রাখি।

বউদি! তুমি কি সে পোস্টার বাড়িতে রেখেছ?

কোথায় রাখব?

কই?

রান্নাঘরের তাকে। কৌটোবাটার পেছনে।

চল তো দেখি।

দেখে দেবাদিদেব বলেছিল, চার-পাঁচটা তো, পুড়িয়ে ফেল!

পঞ্চাশটা ছিল।

বাকিগুলো?

মাঝে মাঝে নিয়ে যায়।

কে ?

ননী।

কেননা ননীবাবু যে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে, এ সন্দেহ দেবাদিদেবের কেন, অন্যদেরও ছিল। ননীবাবু মণিবাবুর চেনা। আগে আসত, কিন্তু আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকে আর আসেনি। অথচ বউদি বলছে, ও আসে, যায়।

দেবাদিদেব বলেছিল, মণিবাবুকে আমি জিগ্যেস করে নিই। তার আগে ননীবাবু এলে তুমি কোন জিনিস দিও না বউদি।

দেবাদিদেব মণিবাবুকে মাঝে-মধ্যে আশ্রয় দিত বলে বউদি দেবাদিদেবের সব কথা মেনে চলত তখন। বউদি বলল, তাই জিগ্যেস করে নিও।

তারপর বারান্দার থামে হেলান দিয়ে বসে রইল বউদি। দূরে ষষ্ঠী পূজার ঢাক বাজছে। বউদি যে গলিতে বাস করে তার মাটিতে-বাতাসে-নর্দমায় চিটেগুড়-তামাক-পেচ্ছাপ-কাঁঠালের-ভুতুড়ি-মাছের নাড়িভুঁড়ি-গলায় দড়ি বাঁধা মরা বেড়ালের দুর্গন্ধ। আশ্বিনের বাতাসে সে গন্ধ বউদির আঁধার-আঁধার ঘর ভরে ফেলেছিল।

দেবাদিদেব বলল, রাঁধবে না বউদি ?

আজ জয়মঙ্গলবার।

কিছুই খাবে না ?

ছাতু আর গুড় খাব।

হঠাৎ বউদি ওর বিস্ময়-ভরা চোখ দেবাদিদেবের দিকে তুলে বলল, কতদিন ও পালিয়ে থাকবে দেবু ? তারপর ওর কি হবে ? কতকাল আমি ওর জন্যে বসে থাকব বল তো ?

একবার দেখা করতে যাবে ?

না দেবু, ওকে কথা দিয়েছি যে। তা ছাড়া পুলিসের লোক তোমাকে নজর করে, আমাকেও। আমি তোমার সঙ্গে গেলে নির্ঘাত তোমার দাদাকে ধরবে।

তা সত্যি।

ও কেমন আছে দেবু? খুব রোগা হয়ে গেছে?

না, খুব রোগা হয়নি।

হলেই বা আমি কি করতাম বল?

তারপর, মায়াময় চোখ দুটি অতলে ডুবিয়ে বউদি বলেছিল, পূজোর ঢাক শুনলে মনটা কেমন করে। ওর জন্যে পূজোও করি না তো! ওর বারণ।

কেন?

দেশমাতৃকা ছাড়া কারো পূজো করতে মানা। একবগ্‌গা মানুষ। বাঙালের গোঁ তো। একবার জানো, কি মাথায় ঢুকল, লোহা-সিঁদুর দাসীর চিহ্ন, পরতে দেবে না। আমাকে দেশের বাড়িতে রেখে, এই সব বলে-টলে নিজে জেলে গেল। আমি তো সব মুছে খুলে বসে থাকলাম। দেশে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। আমাকে সবাই বকল। আমি বললাম, কিছু জানি না। ও এসে পরতে বলুক, তবে পরব।

এখন তো পর?

তখনি ফিরে পরতে হল। পিসশ্বশুর অন্নজল ছেড়ে দিলেন। তিনদিন পড়ে রইলেন। তখন দেখলাম, মহাপাতকী হবো। তাই ফিরে আবার পরলাম সব। ও মা! সে-লোক জেল থেকে ফিরে এসে বলে কি জানো? বলে, তিনদিন খায়নি? ঠিক খেত। অন্ন খেত না, চিড়ে-পাতক্ষীর রামপাল কলা খেত। তুমি এক বল্‌দা।

মঙ্গলবার কর যে?

ঝগড়া করে করি। এ তো ব্রত, ঠাকুর গড়িয়ে তো পূজো করি না। ও বলে, যত সব ঘটির কারবার।

ননীবাবুর কথাটা মনের নিচে খচখচ করছিল। দেবাদিদেব শেষ যেদিন মণিবাবুকে দেখে, মনে আছে, সেটা ৩২ সালের কোজাগরী

পূজার রাতে, সেদিনই জিগ্যেস করি। সেই বহুকালের মত শেষ দেখা। তারপরই মণিবাবু গ্রেপ্তার হয়।

মণিবাবু বলল, দেবু, ননীকে ঢুকতে দিও না। ও ইনফর্মার। এতকাল আসে না। এখন ঘুরে ক্যান্ তা উজ্জ্বলা বুঝেনি।

কেন?

মণিবাবু এক মিনিট কি ভেবেছিল। তারপর বলেছিল, খড়ে প্যাক কইরা বিস্কুটের বড় কৌটায় দুইটা বোমা থুইয়া গেছে দুলাল। ননী হেয়ার জন্য আসে। উজ্জ্বলা য্যান্ নষ্ট কইরা ফালায়।

কেমন করে?

ফাঁকে গিয়া ফালাইয়া দিক কোথাও।

বউদি?

উজ্জ্বলা বউদি দুটি বোমা নষ্ট করতে যাচ্ছে, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়েছিল দেবাদিদেবের। বউদি যে অসম্ভব মেয়েলী, ওর সবটুকুই যে নির্ভরশীল নিঃশেষ ভালবাসা। কিন্তু মণিবাবু বলেছিল, উজ্জ্বলা পারবে। বলগে আমি বল্‌ছি।

দেবাদিদেব বউদিকে সব কথা বলেছিল। বউদি বিচলিত হয়নি। সোডা কাচছিল। কাপড় আছড়াতে আছড়াতে বলল, কৃষ্ণপক্ষ আসুক। এখন পথঘাট ব্ল্যাকআউটেও দেখা যায়।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের জন্য সে কি প্রতীক্ষা! দেবাদিদেব বউদির জন্যে উদ্বেগে আতংকে মরে যাচ্ছিল। বউদি অবিচল, নির্বিকার। যেদিন সেই প্রার্থিত, কাঙ্ক্ষিত, প্রতীক্ষিত অন্ধকারের রাত এল, সেদিন বউদি বলল, চল, জলে ফেলে দিই।

কোথায়?

চল না। বগুল গেটের ওপারে একটা পোড়ো ডোবা আছে, পিণ্টুদের বাড়ি যেতে দেখেছি।

চল

তুমি ছাড়বে না, সঙ্গে যাবে?

যাব।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে বউদি জল তুলে-তুলে টিন-ড্রাম-জালা ভরছিল। ভেজা কাপড়ে দেবাদিদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে, ওর আশ্চর্য চোখ ঝলমলিয়ে বলল, এত ভয় কিসের গো? এত ভাবনা তোমার কেন? যার ভাবনা সে তো ভাবে না? তুমি ভেবে মর কেন?

সে ভাবে না বলে···

তাতে তোমার কি?

বউদি, আলোকিত চোখে, যেন সত্যের আলোয় দেবাদিদেবের অন্তরের অন্তর, যে অন্তরের অস্তিত্ব দেবাদিদেবও জানে না, তা দেখে নিয়েছিল। বলেছিল, বিয়ে কর দিকি! বুড়ো বাপেরও সেবাযত্ন হবে, তোমারও শিরদাঁড়া হবে একটা।

তোমার না বিয়ে দেবার কথা?

হ্যাঁ. বিয়ে দিয়ে সাত কথা শুনি। তাছাড়া তুমি বিয়ে করবে শিক্ষিত মেয়ে। আমি তেমন মেয়ে কোথায় পাব?

দেবাদিদেবের চোখে সেদিন উজ্জ্বলা বউদিকে আশ্চর্য, রহস্যময় মনে হচ্ছিল। যেন ভেতরে আলো জ্বলছিল বউদির। দেবাদিদেবের মত মোহনীয় পুরুষের সান্নিধ্যে সে আলোর একটি দ্যুতিও জ্বালায়নি। মণিবাবুর হুকুমে মণিবাবুর কাজ করছে সেই আনন্দে বউদি ঝলমল করছিল।

একসময়ে ওরা বেরোয়। বউদি দোর বন্ধ করে ওপর তলায় চাবি রেখে এল। ওরা বাস বদলে, হেঁটে বণ্ডেল গেটের কাছে যায়। বউদি বলল, দেবু! হাত ঘামছে, বাক্সটা খোল। তুমি একটা নাও, আমি একটা নিই। টিন পিছলে পড়লে সর্বনাশ হবে।

অন্ধকার! অন্ধকার পথ, অন্ধকার রাত। ওরা হাঁটছে, হাঁটছে। তারপর লাইনের কাছে এল। বউদি একবার 'উঃ' বলল। পায়ে

হোঁচট খেল বুঝি। চটি পরায় অনভ্যস্ত পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে হাঁটছিল। সহসা চাপা গর্জন, হল্ট্!

ওরা থমকে দাঁড়াল।

লাইনের ওপার থেকে হেলমেট পরা সার-সার মাথা উঠে দাঁড়াল। রেলপথ যে নজরাধীন থাকবে তা বউদি না হোক, দেবাদিদেবের জানা উচিত ছিল।

টর্চের আলো বউদির ওপর।

দেবু, পুলিস···মিলিটারি?

হল্ট্. নইলে গুলি করব।

সামনের সশস্ত্র প্রহরা. হাতের ঘর্মাক্ত চেটোয় বোমার স্পর্শ। অন্ধকার রাত, সব কিছু দেবাদিদেবের শরীর ও মনকে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ করছিল। মন কিছুই বলেনি ওকে। হাত, যা করবার তা করছিল। ওর হাতটা বোমাটা চেপে ধরল। ঘামে পিছল চেটো। হাতটা এগোল, ওপরে উঠল। উজ্জ্বলা বউদিকে টপকে লাইনে বোমা ছুঁড়তে হবে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে, ওরা পালাবে।

হাতটা বোমাটাকে ছুঁড়ল।

বিস্ফোরণ, ভীষণ শব্দ। উজ্জ্বলা বউদি সামনে আছড়ে পড়ছে। বউদির হাত লাইনে সজোরে আছড়াল। আবার বিস্ফোরণ, ধোঁয়া। সামনে থেকে গুলি। নো, এ ওম্যান।

ওম্যান?

ইয়েস।

দেবাদিদেব পিছন ফিরে পালাচ্ছে। পালাচ্ছে, পালাচ্ছে, গুলি— বাঁদিকে বেঁকে গেল, আবার বাঁদিকে, আবার ডানদিকে। ধন্যবাদ, নিষ্প্রদীপকে ধন্যবাদ। রাস্তায় ছোটাছুটি। তাও কিছুক্ষণ। তারপরই একটি দরজা খুলে একটা হাত ওকে ঢুকিয়ে নিল।

আস্লাম। কাঠ মিস্তিরি। বলল, শুয়ে যান, চেপে শুয়ে থাকুন। মণিবাবু বা দেবাদিদেব, কেউই আসলামকে কনভার্ট করেননি। এবং

দারিদ্র্য ও ধর্মহেতু আস্‌লাম এই মহানগরীতে সাতপুরুষ ধরেই পরবাসী এবং পরদাসখতে সমুদয় দিয়েছে। তবু মনের সহজাত, শিক্ষা-অপ্রাপ্ত আবেগের বশে ও ওর ধারণার স্বদেশীবাবুকে বাঁচিয়েছিল। পরদিন হিন্দু দোকানের চা এনে দেয়। দেবাদিদেব ওর হাত থেকে জল চেয়ে খেয়েছিল। ফলে দেবাদিদেবের ধর্ম নষ্ট হবে ভেবে আস্‌লাম বিব্রত হয়। তারপর সকাল হল, দুপুর হল। তিনটেয় দেবাদিদেব বাড়ি ফিরেছিল। ফিরেই জ্বরে পড়ে। জ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে বমি। অসুখে আচ্ছন্ন চেতনায় ছবির পর ছবির আনাগোনা, ধোঁয়া, উজ্জ্বলা বউদি, রেললাইন।……

অনেক পরে। মণিবাবুর অনুরোধে, সকলের কথায় উজ্জ্বলা বউদির জীবন নিয়ে লেখা ছোট্ট পাতলা ষোল পাতার বই।

গুলিতে নিহত উজ্জ্বলা বউদি? না দেবাদিদেবের অনিচ্ছুক চেটো থেকে ছিটকে যাওয়া বোমায়? বোমায় যদি মরবে তবে কাঁধে, কলার-বোনে গুলি ছিল কেন? কলার-বোন ও কাঁধের মাঝামাঝি বুলেট বিঁধে থাকলে মানুষ আগে মরে, না বোমায় ছিন্ন-ভিন্ন পিঠ গামলার আকারে হাঁ হয়ে গেলে?

কেউ প্রশ্ন করেনি, জবাব চায়নি। তখন থেকেই উজ্জ্বলা বউদি শহীদ।

স্বাধীনতার পর তো বটেই।

সব প্রশ্ন ও সংশয় ওর একার মনে মনে ছিল।

দেবাদিদেব মাথা তুলল।

পাপবোধ ছিল মনে, অসম্ভব পাপবোধ। নইলে উজ্জ্বলা বউদির স্মৃতিকে অবচেতনের অতলে সরিয়ে রেখেছিল কেন?

কেন পাপবোধ? হাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বলে? বোমাটা কেন বিয়াল্লিশের নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায় ওর হাতকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল? ও কেন বোমাশুদ্ধ হাতকে নিয়ন্ত্রণ করেনি? সেইজন্যে পাপবোধ?

উজ্জ্বলা বউদির আশ্চর্য মায়াবী চোখ, নির্মল হাসি। ওর ছবি

ঘেরা ফুলের মালা। মণিবাবুর গুমরে গুমরে কান্না—আমারে না দেইখা থাকতে পারতা না, আজ আমারে কার হাতে থুইয়া গেলা?

উজ্জ্বলা বউদি থাকলে পরে বলত, ঢং দেখেছ দেবু!

আজ, উজ্জ্বলা বউদির স্মৃতির মুখোমুখি হওয়াও ঘরে ফেরার পথে আরেক কাঁটা সরিয়ে ফেলা। এই যে মুখোমুখি হতে পারছিল না, এরই জন্য মন পালাতে চাইত কি? অন্যান্য বহু জিনিসের সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে বলবন্তের স্মৃতি, উজ্জ্বলা বউদির স্মৃতি, এগুলো থেকে দূরে সরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল।

চেতনে নয়, অবচেতনে। এগুলো যদি পাপ হয়, এগুলো যদি হয় সম্পূর্ণ সততা থেকে পদে পদে বিচ্যুতি, তবু দেবাদিদেব তা সচেতনে করেনি।

অচেতনে করেছে। আস্তে আস্তে অন্যভাবে নিজের ইমেজ বাড়িয়েছে। আস্তে আস্তে অসৎ হয়েছে। হতে হতে আজ এখানে এসে পৌঁছেছে। ঈপ্সিতা, ওর অবক্ষয়ের প্রতিটি স্তর দেখেছে। ঈপ্সিতার মনে হয়েছে বিখ্যাত লেখক দেবাদিদেবের সঙ্গে ওর যুক্ত জীবনটা একটা বিরাট অপচয়।

শুনছেন?

শীলা মেয়েটি এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বলুন।

আপনি অমন হঠাৎ চলে এলেন, ছোট মাসির কথা বললাম বলে? কতক্ষণ ধরে বসে আছেন মাথা হেঁট করে। আমার খুব খারাপ লাগছে।

মেয়েটির দিকে স্বচ্ছ চোখে তাকাতে পারল দেবাদিদেব। চড়াই পাখিটার মত ওকে পিষে দিতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু কোথায় ঘটেছিল সে ঘটনা?

না, খারাপ লাগবার কোন কারণ নেই। বসুন না। মাটিতেই বসুন।

মেয়েটি বসল।

উজ্জ্বলা বউদি আপনার মাসি হত?

হ্যাঁ।

ওর ছেলেমেয়েরা কোথায় আছে?

মিতালী আর জয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। সোনা আর বাবুল চাকরি করছে।

ওরা মামা বাড়িতেই ছিল?

হ্যাঁ। মাসি মারা গেল। মেসোমশাই জেল থেকে বেরোবার পর পেটে ক্যান্সার হয়। বছর কয়েকের মধ্যে মেসো, দাদু, দিদিভাই, সবাই মারা যান। ওরা আমার মার কাছে ছিল।

সেখানেই লেখাপড়া করল?

হ্যাঁ। আমার বাবার লোহার দোকান ছিল। এখনো আছে। কোন অসুবিধে হয়নি। তবে সোনা আর বাবুল জানেন, খুব বদলে গেছে। বাবা নেই। মা ওদের দেখতে চান। এই কলকাতাতেই থাকে। একবারও আসে না আমাদের বাড়ি।

বউদির বাবা কি করতেন?

খড়্গপুরে কনট্রাক্টর ছিলেন।

মণিবাবুর সঙ্গে বউদির বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? মণিবাবু তো রাজনীতি করত।

পিসিমার সম্পত্তি পেয়েছিলেন বলে মেসোমশাইয়ের অনেক জমিজমা ছিল। কালো ছিল বলে মাসির বিয়েও হচ্ছিল না। মেসোমশাই যে পিসেমশাই মরতেই সব জমিজমা বেচে ফাণ্ডে টাকা দিয়ে দেবেন তা কি দাদু জানতেন? তা ছাড়াও, মেসোমশাইদের বাড়ির সবাই স্বদেশী করত। তাতে খুব সম্মান ছিল সমাজে।

মণিবাবুর শহরের বাড়ির চেহারা দেবাদিদেবের মনে পড়ল। দু'খানা ঘর, টিনের রান্নাঘর, টিনের কলতলা, খাটা পায়খানা।

শীলা বলল, মাসিও তো কম নয়। দাছু পঞ্চাশ ভরি সোনা দিয়েছিলেন, সবই দিয়ে দেয়।

শীলা আরো কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর উঠে গেল। ওরা কাল কাশ্মীর যাবে, ভোরের বাসে।

ট্রেন এল। দেবাদিদেব শীলাকে নমস্কার করল, গাড়িতে উঠল।

ট্রেন, ট্রেনের সময়ে ছাড়ল।

পাঁচ

থ্রি-টায়ারে লোয়ার বার্থে বড় চাপা-চাপা লাগে! হাঁপ ধরে যায় ঘুমের মধ্যেও। মনটা খুবই বিচলিত ছিল বলে বোধহয় দেবাদিদেব স্বপ্ন দেখছিল, ছুঃস্বপ্ন। আজকাল আর স্বপ্নও দেখে না আগের মত।

হয়তো রাতের খাবারটাও শরীরে সয়নি। থালির খাবারে ঝাল-মশলা থাকে। ভাত আর রুটিটা একটু ডাল দিয়ে খেয়েছিল শুধু। আসার সময়ে ঈপ্সিতা খাবার দিয়ে দিয়েছিল। যে ভাবে প্রোগ্রাম ফেলেছিল দেবাদিদেব, তাতে পাঠানকোট থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে নেবার কথা। তা তো হল না। টেলিগ্রাম পেয়ে যাওয়া। হঠাৎ টেলিগ্রাম করার মত কি ঘটল?

তপোধন বা ধীমান কি হঠাৎ অসুস্থ হল? সুমনের কিছু হল কি? ছোট ছেলে সুমনকে চিনতে পারে না দেবাদিদেব। লম্বা চুল, গম্ভীর, রঙিন জামাকাপড় পরে, ভারি স্যাণ্ডেল জুতো। রাতদিন অঙ্ক কষে। ন্যাশনাল স্কলারশিপ গোছের কিছু বাগাতে পারলে দিল্লীতে পড়তে যাবে।

বাবার সঙ্গে ছ-মাসে ছ-টা কথা বলে কিনা সন্দেহ। ছেলেরা সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়েছিল। কি লজ্জার কথা এই ছেলেদের নিয়ে! দেবাদিদেব এদিকে বাংলায় ইংরেজী অনার্স ও এম, এ, পরীক্ষা অব্দি

দিতে দেবার প্রস্তাবে উৎসাহী। বাংলা মাতৃভাষা, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হোক, এ নিয়ে ও বহুকাল লেগে আছে।

ঈপ্সিতা বলেছিল, আমি চাকরির পর চারটে করে টিউশানী করছি কেন? তোমার চাকরি-বাকরির দরকার হয়নি, ইংরেজীর ওপর জোর দেবার দরকার হয়নি, তুমি জিনিয়াস। ওরা জিনিয়াস নয়।

আমার ছেলেরা ওইসব স্কুলে পড়বে?

তোমার কোন্ নাম-করা বন্ধুর ছেলেমেয়ে বাংলা স্কুলে পড়ছে? কেরাণীর কাজের জন্যে লাইন দিচ্ছে শুনি?

আমি কি তাদের মত?

নও, সে প্রমাণও দাওনি।

গৃহযুদ্ধে দেবাদিদেব হার মেনেছে বারবার। কলকাতায় থাকাই হয় কত! সমানে তো ঘোরে। ছেলেরা কি পড়বে, কোথায় পড়বে, সব ভার নিতে পারবে না জেনেই দেবাদিদেব চুপ করে যায়। তিন ছেলেই পড়াশোনায় ভাল। কিন্তু কেউই এক কলম লিখল না, কোন চারুশিল্পে, বা সঙ্গীতে আগ্রহী হল না, এ একটা বড় দুঃখ ওব। চাকরি পেল, তাতেই ওরা খুশি।

কিন্তু কার কি হল?

এই প্রশ্ন মনে মনে থেকে গিয়েছিল বলেই বোধহয় দেবাদিদেব শুয়ে, ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নটা দেখল।

হাতের ওপর একটা চড়াই পাখি। দেবাদিদেবের হাতটা স্থির, ছড়ানো. মাদুরের উপর শুয়ে আছে ও। চড়াই পাখিটাকে ও হাতের বিশাল থাবাতে চটকে ফেলছে। কে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করল।

দেবাদিদেব উঠে বসল। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। বাথরুমে গেল একবার। কন্ডাক্টর গার্ড কার সঙ্গে বসে তাস খেলছে। দেবাদিদেব লোকের মালপত্র টপকে আস্তে প্যাসেজ ধরে নিজের সিটে ফিরে এল। দুমড়ে, নিচু হয়ে ঢুকে শুয়ে পড়ল। স্বপ্নটা ওকে ঘারে

ফিরতে বলছে। বিচ্যুতি বা ব্যর্থতা বা পথ ছেড়ে অন্য পথে পা বাড়াবার কারণ স্বরূপ আরেকটি স্মৃতি।

শুয়ে শুয়েই সিগারেট ধরাল একটা। হৃদয়ের গহনে নেমে দেখা যাচ্ছে অবচেতনে বহু স্মৃতিই বন্ধ ও বন্দী ছিল। বলবন্তের কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে দোর খুলে গেছে।

আমনাটোক্‌রি! হ্যাঁ, আমনাটোক্‌রির জঙ্গল। তেভাগা চলছে। উত্তরবঙ্গ। জলপাইগুড়ি। বর্ষাকাল। তিস্তায় বান।

দেবু, চলে যাও। মোহিতদা বলেছিল, সত্যশরণ যেত, কিন্তু পারছে না, বাবার অসুখ।

তখন স্বাধীনতা আসেনি। আসবে বলে রওনা হয়েছে। জলপাইগুড়িতেই প্রথম গিয়েছিল দেবাদিদেব। হারু রায়ের বাড়িতে ওঠে। যাবার কথা পুলকবাবুর সঙ্গে। পুলকবাবু কোথায় কবে থাকত কেউ জানত না: খুব বর্ষা। করলা নদীও পাড় ছাপিয়েছে।

হারু রায়ের বাড়িতে দুদিন। বৃষ্টি থামল। রাতে পুলকবাবু এল। সে রাতেই রওনা হতে হল। অনেক ভেতরে যেতে হবে। পুলকবাবু বলল, নোটবই নেবেন না। যা লিখবেন, চোখে দেখে মনে রাখবেন। গিয়ে লিখবেন। আমাকে প্রথম খসড়া পাঠাবেন। চেক করে দেব।

কথাগুলো শুনে চটে গিয়েছিল দেবাদিদেব। কিছু বলেনি। পুলকবাবুর ওপর কেউ কথা বলে না। লোকটা তেভাগা নিয়ে পড়ে আছে। ওর কথায় হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। প্রতিপত্তি সাঙ্ঘাতিক! সাঁওতাল ভুঁইদাসরা পাহারা দিয়ে চলাফেরা করে।

পুলকবাবুর সঙ্গে দুজন সাঁওতাল তখনো ছিল। লোক দুটো পুলকবাবু ছাড়া দ্বিতীয় বাবুলোকের সঙ্গে কথা বলে না। ওদের মাথায় মাথাল ছিল, পুলকবাবুরও। ওদের পা খালি, গায়ে তেরছা ডোরার ছিটের শার্ট, পরনে হেঁটো ধুতি, পুলকবাবুরও তাই। পুলকবাবুর কোমরে ছোট থলির মধ্যে টিনের কৌটোয় চুণ ছিল।

পুলকবাবুর কথায় দেবাদিদেব রবারের জুতো পরে, মাথায় রবারের টুপি। গায়ে বর্ষাতি। যুদ্ধের দরুণ এসব জিনিস ঢেলে ডিসপোজালে বিক্রি হত। ওরা তিস্তার ধারে আসে। নদীর পাড়ে লাল সিগন্যাল। জল নিরাপত্তা-রেখা অতিক্রম করেছে। এক বিশেষ জায়গায় এসে কল-কল্লোলিনী তিস্তার সামনে দাঁড়িয়ে পুলকবাবু বলে, হেঁটে পার হব।

হেঁটে?

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে-বাদে টালের সমান উঁচু হয়ে জলের দেওয়াল আসছে, চলে যাচ্ছে, নামছে নিচে, আবার জলের দেওয়াল।

আকাশে তারা, একাদশীর চাঁদ। শুক্লপক্ষ। দূর আকাশে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা। পুলকবাবু বলল, একমাত্র জায়গা যেখান দিয়ে পেরনো যায়। হাতে হাত ধরুন।

কিন্তু···

আমি যাই। ভয় নেই কোন।

সাঁতার জানি না যে।

সাঁতার জানলেও বা বর্ষার তিস্তায় কি করতেন? জঙ্গল থেকে বাঘ, গণ্ডার ভেসে আসে শোনেননি?

ওরা হাতে হাতে ধরে নেমেছিল। জলের দেওয়াল আসতে সমুদ্র-স্নানের নিয়মে ভেসে উঠছিল, সাঁওতালরা ও পুলকবাবু নিচে শিক দেওয়া লাঠি বালিতে গুঁজে ভর সামলাচ্ছিল। কিন্তু দেওয়াল ভেসে চলে গেলে বুকের নিচ অব্দি জল। এখানে নদীর বুক খুব উঁচু। চেল্ করে চল্, ঘেশ করে চল্, সাঁওতালরা বলছিল। পরে দেবাদিদেব জেনেছিল চেল্ ও ঘেশ্, দুটি স্থানীয় নদী, খরস্রোতা। 'তাড়াতাড়ি চলতে হবে' বোঝাতে চেল্ ও ঘেশ-এর নাম ওইভাবে ব্যবহার হয়।

তিস্তার ওপারে একটি হুড-খোলা উঁচু আণ্ডিকেলে গাড়ি ছিল।

চালাচ্ছিল যে লোকটা, তাকে দেবাদিদেব হারু রায়ের বাড়িতে দেখেছিল প্রথম দিন। গাড়িটা ওদের সকাল নাগাদ চাহারবুড়ি পৌঁছে দেয়।

চাহারবুড়ি জঙ্গলের সীমান্তে। চাহারবুড়িতে এক দোকানীর বাড়িতে ওরা সারাদিন থাকে। দো-মাচা ধানের টাল। ওপর থেকে টোপের মত ছাউনি নেমেছে। টালটা দেখলে মনে হবে একটা রাক্কুসে বরের টোপরকে কাঠের খুঁটির ওপর বসিয়েছে কেউ। নিচের মাচায় ধান। কাঠের মাচা। মাঝে ফোঁকর। মই দিয়ে ফোঁকর গলে ওপরের মাচায় উঠেছিল ওরা। সেখানেই ছিল সারাদিন।

তুমুল বৃষ্টি নামে এগারোটায়। পুলকবাবু বলল, চলবে চার পাঁচ দিন এখন।

বৃষ্টির মধ্যেই মাথাল মাথায় দিয়ে ওরা একে-একে নিচে নেমে বাঁশঝাড়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে ডোবায় হাত-পা ধুয়ে দোকানীর রান্নাঘরে বসে ভাত খেয়েছিল। দোকানীর বিবর্ণ হলদেটে মুখ, আসন্নপ্রসবা বউ মাটির হাঁড়িতে ডাল রেঁধেছিল, কচুশাকের আগডগা বেটে সরষে লঙ্কা তেলে মেখে কড়ায় ভেজে দিয়েছিল। পুলকবাবু চেয়ে খেল। বলল, ঝাল দিস নাই কেন?

বাবু খাবে।

গাড়ি ঘুরছে কেমন?

খুব। তবে হাতির পাল নামতে কাল হতে তত ঘুরতে দেখি নাই। অনেক হাতি।

দেখেছিস?

শুনলাম।

হাঃ! হাতির পাল।

দোকানী বলল, হ্যাঁ বাবু। হাতি নামল।

পুলকবাবু দোকানীর বউকে বলল, টালের ধান খেতে আসবে। তোকে ধরবে।

বউটি হেসেছিল। পুলকবাবুও। ওই একবার। আর একবারও দেবাদিদেব পুলকবাবুকে হাসতে দেখেনি।

সারাদিন বৃষ্টির শব্দ শুনে দেবাদিদেবের বড় অসহায় ও বিপন্ন মনে হচ্ছিল নিজেকে। প্রকৃতির এই অবাধ ও বন্য রূপ এর পূর্বে ওর তেমন দেখা ছিল না, সেজন্য ভালও লাগছিল।

রাতে ওরা আমনাটোকুরির জঙ্গলে ঢোকে। ঢোকার আগে পুলকবাবু বলেছিল, জঙ্গলের ওপারে তিস্তা পেরিয়ে মাঠ। সেখানে জমায়েত হচ্ছে। আপনি জঙ্গলে চলবার সময়ে একটা কথাও বলবেন না।

কেন, পুলিস আছে?

জঙ্গলে জানোয়ার আছে। বৃষ্টিতে তারাও ঘুরে ঘুরে বড় গাছের তলা খোঁজে। পুলিস যায় জীপের পথে। জঙ্গলে জীপ চলে না।

জানোয়ার!

হ্যাঁ। আর শুনুন, পায়ে জোঁক ধরবে। চলার সময়ে পায়ের দিকে চাইবেন না, ভয় পাবেন। ছাড়াতেও যাবেন না। পরে ছাড়িয়ে ঘায়ে চুন ঘষে দেব। সাঁওতালদের বলেছিল, হ্যাঁ রে, একোয়াটা আছে, না চলে গেছে?

যাবে কোথা? ঘুর্যে বুলছে।

একোয়া কি, পুলকবাবু?

দল থেকে হাতি, পুরুষ-হাতিকে বের করে দিলে একোয়া হয়ে যায়। এটা বুড়ো, তবে দাঁতাল। ক'দিন ঘুরছে।

আমনাটোকুরি রিজার্ভ ফরেস্ট। উত্তরবঙ্গের ভীষণ, হিংস্র, বিদ্বেষী জঙ্গল। চারদিকে বড় গাছ, ছোট গাছ, নিচের মাটি দেখা যায় না। বর্ষার জলে আগাছা বেড়ে সবুজে সবুজ করে ফেলেছে সব। কি এক রকম লতা এ গাছ থেকে ও গাছে গিয়ে জড়িয়ে বুনোটজাল বুনেছে। পুলকবাবু আর সাঁওতালরা ছোট সোজা দা দিয়ে লতা কেটে কেটে

যাচ্ছিল। এ জঙ্গল দেখলে, 'দাও ফিরে সে অরণ্য' বলা সম্ভব নয়। এ জঙ্গল হিংস্র প্রকৃতির স্বাধীন রাজ্য, মানুষের ওপর এর বিদ্বেষ।

সাঁওতালরা খ্‌খোঃ খ্‌খোঃ খ্‌খোঃ করে জন্তুর ডাকের মত একরকম শব্দ করছিল গলায়। গাছের ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে তারা পায়ের কাছের আগাছা পিটছিল। পুলকবাবুর দিকে সপ্রশ্নে চেয়ে ছিল দেবাদিদেব। পুলকবাবু চাপা গলায় বলল, সাপ তাড়াচ্ছে।

'সাপ' শুনেই দেবাদিদেবের ভীষণ আতঙ্ক হয়। সাপে বড় ভয় ওর। সাপুড়ের সাপ খেলার সাপ, চিড়িয়াখানার কাঁচের খাঁচার সাপ কোনদিন দেখতে পারেনি ও।

কি সাপ আছে?

পুলকবাবু জবাব দেয়নি। হঠাৎ একটি জায়গায় পৌঁছয় ওরা। সেখানে এক সুঁড়ি পথ। পথটা দেখে দেবাদিদেব যেন অকূলে কূল পেয়ে যায়। ওই পথে চলে যায় ও। পুলকবাবু ওর হাত চেপে ধরে।

আমি এই পথে যাব।

না।

দুজন সাঁওতাল ওর সামনে পিছনে চলে যায়। বন্দী নাকি ও? বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে। বর্ষাতি বেয়ে টুপি বেয়ে। পুলকবাবুর গা বেয়ে জল ঝরছে। পুলকবাবু কথা বলে না। ওকে দেখে।

এই পথে চলুন।

পুলকবাবু আস্তে বলে, সত্যশরণ আসেনি, আপনি এসেছেন। আপনি এখন আমার হেফাজতে। আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। আপনার দায়-দায়িত্ব এ বেল্টে আমার। জলপাইগুড়ি পৌঁছানো অব্দি।

দেবাদিদেবের কান্না পায়, হতাশ লাগে। ও আবার জঙ্গলে ঢোকে। ওর পিছনের সাঁওতালটি আবার সামনে চলে যায়। ফিসফিস করে বলে, শালো, গুয়ালকাঁড়ের জাগ মরে না। সেদিন কাটলম।

বৃষ্টি পড়তে থাকে, পড়তে থাকে। সোজা ধারায়, অঝোরে। গাছপাতায় বৃষ্টির ধারার ঝমঝম শব্দ। যেন ড্রাম পেটাচ্ছে, কেউ চাপা শব্দে, হাল্কা লাঠিতে। এখন ওরা বাঁশবন দিয়ে চলে। হাতির প্রিয় বিচরণ ভূমি। হাতি কাঁচ বাঁশপাতা ও ডাল ভালবাসে। বৃষ্টিতে চোখ ঝাপসা। দেবাদিদেব কল্পনায় বৃষ্টির ঝালরের ওপাশে একোয়া এক বৃদ্ধ দাঁতালকে দেখতে থাকে। গোয়ালকেঁড়ে লতার প্রতিটি ডগাকে মনে হয় হিংস্র বিষধর।

পুলকবাবু কথা বলে না। যেন কথা বলতে হতে পারে সেজন্যেই ও এগিয়ে যায় সাঁওতালদেরও সামনে। দ্বিতীয় সাঁওতালের হাত থেকে ডালটি নেয়। এখন ওরা তিনজনই খ্‌খোঃ খ্‌খোঃ খ্‌খোঃ শব্দ করতে থাকে। এই বিদ্বেষী ও হিংস্র জঙ্গলের নির্মম আত্মা যেন তিনটে, বন্য প্রাণীর মত শব্দ করে দেবাদিদেবকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। ভশভশে পাতাপচা কাদায় পা ডুবে যায়।

পা ডুবে যায়, পা তুলে হাঁটে ওরা। ত্রয়োদশীর চাঁদ মেঘে ঢাকা। কিন্তু মেঘের নিচে, ওপরে চন্দ্রালোকিত আকাশ আছে বলে অন্ধকার তরল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখতে না পেলে দেবাদিদেব মরে যেত। নিরুদ্দেশ যাত্রা। কিন্তু সামনে, 'হোথায়' স্নিগ্ধ মরণ নেই। যদি মৃত্যু থাকে তবে তা হিংস্র। সাপের ছোবল, হাতির শুঁড় ও সামনের পা, গুলি। পুলকবাবুর এতটুকু দিক ভুল হয় না। মোহিতদা বলেছিল, প্রত্যেকটা জঙ্গল, প্রত্যেকটা পথ নখদর্পণে।

কতক্ষণ ধরে চলে ওরা জানে না। এক সময়ে ওরা জঙ্গল ছাড়ায়। একটা লোক বেরিয়ে আসে গাছের নিচ থেকে। গাছে ঠেস দিয়ে ভিজছিল। রোগা লোকটা, পাকানো চেহারা। পুলকবাবুকে কি যেন বলে। পুলকবাবু শোনে। তারপর ওরা বাঁ পাশে ঘোরে।

বনবিভাগের একদা তৈরি, অধুনা বহুকাল পরিত্যক্ত এক কাঠের খুঁটির ওপর মাচানে তৈরি জীর্ণ ঘরে ওঠে ওরা। মই নেই। গাছের

ডাল কেটে কাঁচা মই তৈরি হয়েছে। ভোর হওয়া অব্দি থাকবে। দেবাদিদেবকে পা ঝুলিয়ে বসতে দেওয়া হয়। পুলকবাবুরা কেউ কথা বলে না। এক সময়ে লোকটির পকেট থেকে টিনের কৌটো নিয়ে খুলে ফেলে পুলকবাবু। একটা বিড়ি নিজে ধরায়, দেবাদিদেবকে একটি দেয়।

কিছুক্ষণ বাদে পুব আকাশ ফর্সা হয়। দেবাদিদেব নদীর গর্জন শোনে। ওরা নেমে আসে। জঙ্গল পেরিয়ে আবার তিস্তা। দেবাদিদেব বুঝে পায় না তিস্তার পাড় থেকে চাহাড়বুড়ি এসে, জঙ্গলে ঢুকে, এত হেঁটে, আবার তিস্তার পাড় দেখা যায় কি করে? পুলকবাবুর দিকে ও একবার চায়।

পুলকবাবু বলে, চাহারবুড়ির পর জঙ্গলে ঢুকে আমরা একটা সার্কুলার পথে এলাম।

নদীর পাড়ে কাশবনে ঢোকে ওরা। পুলকবাবু বলে, বিশাল জমায়েত। দেখলে ভাল লাগবে।

কখন যাবেন?

দেববাবু, আগে জোঁক ছাড়ান।

এতক্ষণে পায়ের দিকে চায় দেবাদিদেব। এবার ভয়ে আতঙ্কে চ্যাঁচাতে যায়। সাঁওতালদের একজন বসে পড়ে। সে ওর পা থেকে জোঁক ছাড়ায়। ওর নিজের পায়েও লালচে, কালো, স্ফীত জোঁক। জোঁক ছাড়াতে রক্ত পড়ে। পুলকবাবু বসে পড়ে দেবাদিবের পায়ের ক্ষতে চুন দিতে থাকে। তারপর বলে, বালির ওপর জোঁক নেই। বসুন, বিশ্রাম করুন। এখন ও-ও নিজের পায়ের জোঁক ছাড়ায়। বলে, চুন ভাল অ্যান্টিসেপটিক।

পুলকবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে বৃষ্টি থামে। ওরা আধমাইল হাঁটে ও একটি গ্রামে ঢোকে। এক গয়লার বাড়ি। বোঝা যায়, পুলকবাবু এ গ্রামে সদাই আসে এবং এখানেই দু-দণ্ড বসে।

চা খেয়ে দেবাদিদেব বাঁচে। একটি চালাঘর। বড়-সড়। একদিকে কাঠের আঁচে দুধ জ্বাল হচ্ছে. দই পাতা হবে। ঘরটি অসহ্য

গরম। সে ঘরে পুলকবাবু ও সাঁওতালরা জামা শুকিয়ে নেয়, ধুতির একটা খোঁট কোমরে জড়িয়ে খোঁট শুকোয়। দেবাদিদেব বর্ষাতি পরে জামা, ধুতি ও গেঞ্জী শুকোয়।

এখানে ওরা মুড়ি ও চা খেয়ে নেয় ও আবার হাঁটে। এত হাঁটায় অনভ্যস্ত দেবাদিদেবের শরীর ও পা ব্যথায় ছিঁড়তে থাকে। দু' কাঁধে ব্যথা, পিঠে ব্যথা। যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে সব। জ্বর-জ্বর লাগে। আবার নিশ্চুপে চলে ওরা। তারপর এক জায়গায় তিস্তা পার হয়। গাড়ি পার-করা কাঠের ফ্ল্যাটে। পুলকবাবু বলে, এসে গেলেন দেববাবু, তারপর ধনবসতি গ্রাম পেরিয়ে গিয়ে এক চাষীবাড়িতে বিশ্রাম করে। দেবাদিদেব স্নান করে না। শুয়ে পড়ে ভাত খেয়েই। এক সময়ে পুলকবাবু ওকে তুলে দেয়। বলে, চলুন, অনেক ঘুমিয়েছেন। তিনটে বাজে।

মিটিং শুরু হয়ে গেছে ?

না, চলুন।

মিটিঙে যাচ্ছি তো ?

না, জলপাইগুড়ি ফিরছি।

কেন ?

খবর এসেছে, ওরা ওদিকে ব্যারিকেড করে লোক আটকেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্তত চোদ্দ-পনেরোজনকে ধরেছে।

চলুন।

দেবাদিদেব বিনা-প্রতিবাদে উঠে পড়ে। পুলকবাবু বলে, এবার যে পথে এসেছি সে পথে যাব না।

যেতে হলে যেতে হবে, দেবাদিদেব আন্তরিক সততায় বলে। বলে, কাল ভয় পেয়েছিলাম খুব, কিন্তু এলাম তো। ঠিক পারব। চলুন।

পুলকবাবু বলে, না, ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। চলুন, অন্যপথে ফিরি। চমৎকার পথে নিয়ে যাব।

গ্রামের দুজন লোক পুলকবাবুকে ডেকে নিয়ে কি যেন বলে। পুলকবাবু বলে, চলে যেতে বল। সাইকেল নিয়ে চলে যাও। তারপর দেবাদিদেবকে বলে, চলুন, দেরি করব না। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরব।

এখানে ?

না, অন্য জায়গায়। আরো দূরে।

সত্যি !

হ্যাঁ ?

মোহিতদা আপনার কথা বলেছিল।

মাচার ওপর থেকে সাইকেল নামানো হয়। তিনজন লোক, কেরিআরে পুলকবাবু, দেবাদিদেব ও একটি সাঁওতালকে নিয়ে রওনা হয়। পুলকবাবু ডেকে বলে, আমনাটোকরি দিয়ে এসেছেন, আমনাপোখরি দিয়ে ফিরবেন। আমনাপোখরি, আমনাটোকরির যমজ জঙ্গল।

তিস্তার তীরে একটা নতুন জায়গায় ওরা সাইকেল থেকে নামে। বৃষ্টি নেই। নদী স্ফীত, অপ্রকৃতিস্থ। ওরা গাড়ি-বওয়া আরেকটি ফ্ল্যাটে পেরোয়। আষাঢ়ে বেলা। চারটে না বাজতেই রোদ ওঠে এবং সব যেন চিড়চিড়িয়ে পুড়তে থাকে। ওরা কাশবনে ঢুকে পড়ে। খুব উঁচু-উঁচু কাশ গাছ। তারপর জঙ্গলে ঢোকে। কাল যে লোকটিকে দেখেছে দেবাদিদেব, সে নিচু গলায় শিস দিয়ে বেরিয়ে আসে। ওদের ডেকে ভেতরে টেনে নেয়। পুলকবাবুকে কি বলে। পুলকবাবু দেবাদিদেবের হাত টেনে ছুটতে ইশারা করে।

ছুটতে থাকে ওরা। ভশভশে পাতা-পচা কাদায় পা ডুবে যায়, পা তুলে ছুটতে হয়। নিশ্চয় গুরুতর কিছু। কেননা জঙ্গল একই রকম। কিন্তু খ্‌খোঃ খ্‌খোঃ শব্দে সাপ তাড়ায় না ওরা। বন-বিভাগের নয়, কাঠ-ব্যবসায়ীদের একটা মাচান-ঘরের মাচার নিচে চলে যায় ওরা। এখন গাছ কাটার মোরসুম নয়। মাচান-ঘরটি

তালা মারা। নীচে, ঘরের উঁচু খুঁটিতে গায়ে-গা মিলিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে।

জায়গাটা তিস্তার তীর থেকে এমন কিছু দূরে নয়। নদীর দিক থেকে লোকের গলা, জীপের শব্দ শোনা যায়। পুলকবাবু ফিসফিসিয়ে বলে, প্রায় পেছন-পেছন এসেছে।

সেখানেই ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। ওপরে বন্ধ ঘরের কাঠের মেঝেতে কিসের শব্দ। শেষোক্ত লোকটি বলে, সাপ চলছে। এখন আর 'সাপ' শুনে কিছুই মনে হয় না দেবাদিদেবের। বরঞ্চ মনে হয়, একদম আতংকিত না হয়ে, পুলকবাবুর ওপর কোন বোঝা না হয়ে এমন করে চলতে পারছে বলে পুলকবাবু ওকে পছন্দ করছে, সেটাও একটা মস্ত লাভ।

এই ভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে, সন্ধ্যে হলে ওরা হাঁটতে থাকে। শেষোক্ত লোকটির হাতে টর্চ। যুদ্ধের মাল। ডিসপোজালে কেনা। টর্চ অবশ্য কমই জ্বালা হয়। ওরা এবার সুঁড়িপথ ধরে চলে। লাঠি ঠুকে চলে সাঁওতালটি। তারপর, দেবাদিদেবের ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা, ওরা চাহারবুড়ির মত আরেকটি গ্রামে পৌছয়। এক ভুঁইমজুরের বৃদ্ধা মা'র ঘরে রাত কাটায়। ভোর না হতে শেষোক্ত লোকটি চলে যায়। দেবাদিদেবরা এই গ্রাম থেকে বেলা দশটায় বেরোয়। তিস্তার এপারে, বন ও নদীর মাঝের সিঁথিপথ ধরে খানিক চলে ওরা অপেক্ষা করে। এক সময়ে সেই লোকটি গাড়ি নিয়ে আসে। ওরা চড়ে বসে। তারপর একসময়ে তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়ি পৌছে যায়।

হারু রায়ের বাড়ি পুলকবাবুও থেকে যায়।

দেবাদিদেবের শরীর এখন ট্রেনের দোলানিতে দুলছে। মনে আছে, সব মনে আছে। পুলকবাবুও সেদিন থেকে যায়। গরম জলে লবণ দিয়ে স্নান করতে ক্লান্তি কাটে খুব। হারু রায়ের বোন শিক্ষিকাও বটেন, কর্মীও বটেন, কিন্তু বিধবা। জিগ্যেস করে যান

পুলকবাবুকে কি যেন। পুলকবাবু বলে, থোড়ের বঠি, আলুর চোখা। বঠির থোড় যেন ঠিক করে কোটা হয়।

মহিলা খুশি না অখুশি, বোঝা যায় না। তবে খাবার সময়ে বঠি ও আলুর চোখা দেখে দেবাদিদেব বলে, বঠি যে ছেঁচকি, চোখা যে খোশাভাজা তা ভুলেই গিয়েছিলাম।

হারু রায় বলে, শুনেছি আপনার বউ বেজায় শিক্ষিত?

না-না, এমন কি আর···

রাঁধেন?

কম। সময় পায় কোথায়? চাকরি, টিউশনি···

খাওয়ার পর পুলকবাবু বলে, আজ থেকে যাচ্ছি। তাস খেলুন দেববাবু। শুয়ে পড়লে শরীর খারাপ হবে। বরঞ্চ সন্ধে নাগাদ তাড়াতাড়ি খেয়ে শোবেন।

আপনারা খেলুন, আমি দেখি।

দেবাদিদেব পাশে শুয়ে থাকে মাদুরে, আধকাতে। ওরা তাস খেলে। পুলকবাবু বেশ পাকা খেলোয়াড় বোঝা যায়। দেবাদিদেবের হাতটা এলানো থাকে জানালার দিকে। হাতে মৌরি। মুখশুদ্ধি করতে দিয়েছিল।

শুয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখ খোলা থাকে। তাসখেলার দিকে নিবদ্ধ, কিন্তু কান থাকে এক নবাগতের কথার দিকে।

লোকটি ঢুকতেই হারু রায় বলে, আমার শালা, দেববাবু। ডাক্তার। শরীর খারাপ লাগে বলুন। ও সব অসুখে মেপাক্রিন দেয়।

লোকটি হাসে। বোঝা যায়, এই কথা বলেই হারু রায় ওকে সবার কাছে পরিচয় করায়।

লোকটি বলে, পুলকদা দুদিন থেকে যান।

কেন, ধরিয়ে দেবে?

এ কথাটাও লোকটি নিশ্চয় বহুবার শুনেছে। বলে, ওরা জানে

আপনি মেয়ের বিয়ের পর এখানেই আছেন। দুদিন থাকুন, দেখে যাক।

কাল যাব অনিল।

আজও আসতে পারে।

আসুক না। দত্ত লোকটা খারাপ নয়।

বাড়ি যাবেন না?

যাব, যাব। তুমি গিছলে নাকি?

হ্যাঁ। জ্যেঠিমা বলেছেন বাড়ি যেতে।

এই তো যাব।

শুনছিল দেবাদিদেব। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পুলকবাবুকে। লোকটা একেবারে নিরুদ্বিগ্ন। এতখানি বয়স, এতদিন রাজনীতি করছে, শরীরও তেমন জুতের নয়। দেখতে ভারিসারি হলে কি হয়, আশ্চর্য বোঝবার শক্তি। শুনছিল, পুলকবাবুকে দেখছিল। তখনো দেবাদিদেবের মানসিকতা অন্যরকম। খুব অন্যরকম। দুর্ভিক্ষের পর ক-বছরই বা কেটেছে। ওর মনে হচ্ছিল. তেভাগার পটভূমিতে লোকটাকে নায়ক করে জীবনী-উপন্যাস লিখবে একটা। ভাবছিল, ওর হাতে কে যেন কি ঠুকছিল একটা। আড় চোখের কানাচ দিয়ে চেয়ে দেখল, ওর মাদুরের ওপর বেছানো হাতের ওপর মৌরি। একটা চড়াই পাখি আসছে, বসছে, মৌরি নিচ্ছে, উড়ে গিয়ে জানালায় বসছে।

ও ভাবছিল জঙ্গল দিয়ে চলার সময়ে লোকটা জঙ্গলের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, চাহারবুড়িতে দোকানির পরিবারের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, সেই গয়লার বাড়িতে, গ্রামে চাষীর বাড়ি, জঙ্গলে ফিরতি পথে সেই বুড়ির বাড়ি, এখন এখানে, সর্বত্র লোকটা এক হয়ে যায়। পুলকবাবুই থাকে, প্রতিটি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে, নেতৃত্বের স্বভাবে নিমজ্জিত। স্বভাব, অনুশীলন দ্বারা উন্নতি। আশ্চর্য, আশ্চর্য লোক।

মনের টেলিপ্যাথি। পুলকবাবু তাস খেলতে খেলতে বলল, যাবার সময়ে দেববাবু ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে একেবারে চমৎকার! না মশাই, ভাল-করেছেন এসে।

দেবাদিদেব বুঝল, পুলকবাবু ওকে মনের বাইরের কামরার দোর খুলে দিয়েছে। বেশ গর্ব হচ্ছিল। হাতে পাখিটা আবার ঠোকরাল।

আবার আসবেন।

নিশ্চয়।

পাখিটা ঠোকরাল। হঠাৎ, দেবাদিদেব কি করছে, নিজে তা বোঝার আগেই ওর হাতটা থাবা হয়ে ওর বিস্মিত, অবিশ্বাসী চোখের সামনে অনৈচ্ছিক পেশীর তাগিদে ও তাড়নায় পাখিটাকে চেপে ধরল। ওর আঙুলের চাপে কোমল, পালক-ঢাকা গলা পিষে গেল। পাখিটার নরম শরীর একটু কাঁপল, তারপর ছোট্ট হৃৎপিণ্ডের ছটফটানি,...তারপর পাখিটা এলিয়ে গেল।

তিন জোড়া বিস্ফারিত চোখ। দেবাদিদেব আধশোয়া, এলায়িত। হারু রায়ের শালার গলায় অস্ফুট শব্দ। পুলকবাবুর চোখে ঘৃণা, ক্রোধ, উপেক্ষা, দৃষ্টি স্থির।

দেবাদিদেব আধশোয়া, এলায়িত। পুলকবাবু উঠে দাঁড়াল। বলল, হারু, আজই ওঁকে রওনা করে দাও। দেববাবু, আপনি এবারকার সফর নিয়ে এক লাইনও লিখবেন না।

পরে পুলকবাবু মোহিতদাকে বলেছিল, ওর বিষয়ে সাবধান থেকো। ক্ষমতা দিলে ও অন্যদের পক্ষে ডেঞ্জারাস্ হবে। মানুষ চিনতে এক লহমাই যথেষ্ট মোহিত। মানুষ চিনতে পুলক সিংগি কখনো ভুল করেনি।

এখন, পাঠানকোট-শেয়ালদা এক্সপ্রেসের দোলানিতে দুলতে দুলতে দেবাদিদেবের মনে হল, এই অতীত ঘটনাটা কি ভাবে তাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে? সেদিনের সেই ঘটনাটায় কোন্‌খানে সে ব্যর্থ

হয়েছিল! আজ ও বুঝতে পারছে, কেন, বহুজন বলা সত্ত্বেও তেভাগা নিয়ে ও কোন উপন্যাস লেখেনি। পুলকবাবু এ ঘটনার তিন বছরের মাথায় মারা যায়। তখনো কিছু বলেনি ও, লেখেওনি। বরং আজ স্বীকার করা যাক, ও স্বস্তি পেয়েছিল। ওর একটা দুর্বলতা, একটা অমানবিক আচরণের জন্যে যার কাছে ও সবচেয়ে বেশি লজ্জিত, সে নেই। বিরাট স্বস্তি।

এখন মনে হল, পুলকবাবু ওকে যদি এক কণা গ্রহণ করে থাকে ভেতরে, নিজের ভেতরে, এই ঘটনায় ওর ভেতরের অদ্ভুত, অনিয়ন্ত্রণীয় অসহিষ্ণুতা বুঝে ফেলে তখনি ওকে বর্জন করেছিল। ও সাধ্যমত সততায় লিখতে পারে, কিন্তু বর্জনীয় হবার উপাদান ওর স্বভাবে ও রক্তে নিহিত ছিল তা পুলকবাবু বুঝেছিল। বুঝেছিল বলে দেবাদিদেব নিজের অবচেতনে তেভাগা, উত্তরবঙ্গের জঙ্গল, পুলকবাবু, সব বিষয়ে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ওই পুলকবাবুই, নেড়ি কুকুরের বাচ্চাকে নির্যাতন করছিল বলে জলপাইগুড়ির অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠের একমাত্র দুলাল ছেলেকে সাইকেল থেকে নেমে ভীষণ মেরেছিল।

স্বীকৃতি, নিজের কাছে নিজের স্বীকারোক্তি। অদ্ভুত ও জটিল এক দ্বৈত স্বভাব ভেতরে ছিল, স্বভাবে, প্রকৃতিতে। তাই ক্রমেই নিরাপদ পথ খোঁজা, তাই ক্রমে পলায়নী-সাহিত্য সৃষ্টি করে চলা, এবং নিজে যে প্রতিশ্রুত, সে ইমেজ সযত্নে কাঠ-খড় থেকে মাটিতে, রঙে, ডাকের সাজে সাজিয়ে তোলা। পুতুলেরই প্রতিমা হতে সাধ যায়। পুলক সিংহরা প্রতিমা হয়েই আসে, আপনি প্রতিষ্ঠা পায়। চেষ্টা করে না। সবাই তাদের আহ্বান করে, বেদীতে বসায়। তাদের বিসর্জন দিলেও তাদেরই ফিরে ফিরে অন্য চেহারায় পূজা করতে চায়। দেবাদিদেবদের চেষ্টা করে স্ব-প্রতিমাকে পূজা পাওয়াতে হয়। তাই ক্ষমতার লোভ। তাই তরুণদের একদিকে অনুপস্থিত করে দেওয়ার চেষ্টা। আবার তাদের কাছে বিশ্বাস্য হবার আকুতি, শ্রদ্ধা পাবার আকুলতা, তাদের বিশ্বাস অর্জনের আকাঙ্ক্ষা।

ঘরে ফেরা। আরেকটি স্বনিহিত কাঁটা তুলে ফেলা গেল। আর কে রইল? ঈপ্সিতা। শেষ যুদ্ধ। দেবাদিদেব চোখ বুজল। ট্রেন অন্ধকার কেটে ছুটে চলল।

ছয়

ঈপ্সিতা। ঈপ্সিতা ব্যানার্জি। দেবাদিদেব যে হঠাৎ ঈপ্সিতাকে বিয়ে করবে তা অন্যরা ভাবেনি, দেবাদিদেবও আগে জানত না।

ললিতাও জানত না।

ললিতা ওকে ভালবাসত। ধনী বাপের মেয়ে, অসম্ভব স্বাধীনচেতা, নিজের যা মনে হত তাই করত। তিন ভাই ওকে প্রশ্রয় দিত। ওরাই ওর সঙ্গী এবং বন্ধু ছিল। দেবাদিদেব বলত, ভায়েরাই তোমার মাথাটি খেল।

মাথা খাওয়া কাকে বলে?

এই যে রাত নেই, দিন নেই, আমার সঙ্গে ঘোর, ভাইরা কিছু বলে না?

বাজে ব'ক না। কেন বলবে শুনি?

জিগ্যেসও করে না কোথায় যাচ্ছ?

জিগ্যেস করবে কেন? আমি তো বলেই বেরোই তোমার কাছে আসছি।

দেবাদিদেবের বাড়িতেও আসত ললিতা। রান্নাঘরে বসে বামুনদির কাছে চা চেয়ে খেত। একবার দেবাদিদেব ছিল না বাড়িতে, ললিতা এসেছিল। বাবার কাশির ওষুধ এনে দিয়েছিল।

বেশ গান গাইত ললিতা। দেবাদিদেবের সঙ্গে একটা মিটিঙে গিয়ে গান গেয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। সবাই জানত, ললিতাকে দেবাদিদেব দলে টেনেছে, দেবাদিদেবের ব্যক্তিত্ব। দেবাদিদেব আর ললিতা একদিন বিয়ে করলে সেটা স্বাভাবিকই হবে।

ললিতা ধরেই নিয়েছিল বিয়ে হবে। তুজনেই যখন স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, দেবাদিদেব আর ওর বিয়েতে কোন বাধা থাকবে না।

ললিতা ভাবত, ও যখন দেবাদিদেবকে মনে প্রাণে ভালবাসে, দেবাদিদেব যখন সে কথা জানে, জেনেও ওর সঙ্গে মেশে, তখন দেবাদিদেবও ওকে ভালবাসে, সমানই ভালবাসে।

কিন্তু ও বুঝত না, যেহেতু ও স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্ব আছে ওর, সেজন্যেই দেবাদিদেব মনের দিক থেকে একটা আড়াল অনুভব করে। দেবাদিদেবের মনে আরো একটা ধারণা ছিল। ললিতা যদিও বলত, আমি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি দেব।

দেবাদিদেব তা বিশ্বাস করত না। যে এত স্বাধীনচেতা, যার এত ব্যক্তিত্ব, সে কেমন করে দেবাদিদেবের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে? ললিতা খুব খোলামেলা স্বভাবের মেয়ে ছিল। কোন দ্বিধা, সংকোচ, ভীরুতা ওর মধ্যে ছিল না।

দেবাদিদেব ওর মুখ থেকে প্রেমের স্বীকারোক্তি শুনে যেত, শুনতে ভাল লাগত, কিন্তু অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস আসত না। আজ দেবাদিদেব বোঝে, বিশ্বাস না আসা ভুল। কেননা ললিতার ব্যাপারে ও অত্যন্ত অন্যায় করেছিল। ওর বোঝা উচিত ছিল, ললিতা সত্যি কথাই বলছে। ওর বিশ্বাস করা উচিত ছিল, ললিতা ওর প্রত্যাখ্যানে চিরতরে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যেতে পারে। জীবনে এ রকম হয়। কোন কোন মেয়ে এত ভালবাসতে পারে, তাদের ভালবাসা এমন সর্বগ্রাসী, অস্তিত্ববিলোপী হয়, এমন শক্তিমান হয় যে, তারা সে ভালবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ভালবাসাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। বাইরে থেকে দেখে মনে হতে পারে, এ মেয়ের সব আছে, কিন্তু ভালবাসায় প্রত্যাখ্যাত হলে সেই মেয়েরই জীবন ব্যর্থ, অন্ধকার, কেন্দ্রচ্যুত হতে পারে, তা সেদিন দেবাদিদেব জানত না।

ললিতা খুব সহজে বলত, জানো, তোমাকে সকাল থেকে দেখিনি, সন্ধ্যায় না দেখলে বোধহয় মরেই যেতাম।

মাঝে মাঝে ও দেবাদিদেবের মুখে ও হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলত, তুমি আমার সব, সে কথা কখনো ভুলে যেও না।

ললিতা বোঝেনি। ওই যে ওর ব্যক্তিত্বের বাইরের চেহারা, ওই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আত্মনির্ভরতা, স্বাধীনচিত্ততা, যে জন্যে দেবাদিদেবকে বলে, তোমায় আমি অ্যাডমায়ার করি, সে জন্যে যে-যে কারণে এই উক্তি, সে-সে কারণেই দেবাদিদেব আড়াল ও বাধা অনুভব করত। ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সে।

না-না, ললিতাকে বিয়ে করবে না এমন কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ওর ছিল না। ললিতাকেই বিয়ে করত ও, তাতে কোন ভুল ছিল না। দেবাদিদেব অত হীন নয়। ললিতাকে বিয়ে ও করত, যদি না ঈপ্সিতাকে দেখত।

কিন্তু নিজের জন্মগত রক্তে লালিত কিছু কিছু ধারণাও কি সেজন্যে দায়ী নয়? সেই মেয়েকে ও মনে মনে খুঁজছিল, ললিতার মধ্যেই খুঁজছিল, যে যখন বলে, তুমি আমার সব, সে কথা ভুলে যেও না, তখন সহজেই মনে বিশ্বাস আসে।

যখন বলে, আমি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি দেব, তখন সে কথায় বিশ্বাস আসে। সে মেয়ে একান্তই নারী, দেবাদিদেব পুরুষ। তাকে দেবাদিদেব আগলে রাখবে, আশ্রয় দেবে, তার নির্ভর হয়ে উঠবে। ললিতাকে ও বলত সে কথা। ললিতা বলত, আমি সেই মেয়েই দেব। দেবাদিদেবের অন্তর বিশ্বাস করত ললিতাকে, কিন্তু অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস আসত না। ও ললিতার মধ্যে ললিতার চরিত্রগুণ ও উজ্জ্বলা বউদির মণিবাবুর প্রতি নির্ভরশীল প্রেম, এই দুয়ের সমন্বয় খুঁজত। ললিতার কাছে থাকলে ওর নিজেকে পুরুষ মনে হত, একমাত্র পুরুষ মনে হত না। ললিতার পৃথিবীতে ও যে সূর্য হতে পারে, তা ও বিশ্বাস করতে চাইত, পারত না।

ললিতা কখনো বোঝেনি কোথায় দেবাদিদেবের বাধা, কোথায়

আড়াল। কেননা দেবাদিদেব আজ যেমন করে তেতাল্লিশ সালের দেবাদিদেবকে দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে, সেদিন তা পারেনি। হ্যাঁ, ললিতা আমায় ভালবাসে, আমি ওকে ভালবাসি, আমাদের সম্পর্ক খুব মুক্ত। একপক্ষের ভালবাসায় ভাটা ধরলে আরেকপক্ষ তাকে মুক্তি দেবে, এসব কথা ওরা বলত। ললিতা বলত, এসব আলোচনা ভিত্তিহীন। কোনদিন তা ঘটবে না। আমি তোমায়, তুমি আমায়, চিরদিন ভালবাসব, ভালবাসবে।

অশোক বিশ্বাস! ডাক্তার, নম্র, লাজুক ও সৎ ছেলে, দেবাদিদেবের বন্ধু ছিল। ও যখন কলকাতায় থাকত, রোজ বিকেলে চারটে থেকে সাতটা কোথায় উধাও হয়ে যেত। সবাই বলত, প্রেম করতে যায়। অশোক প্রতিবাদ করত না, 'হ্যাঁ-না' বলত না, হাসত।

তোমার লেখার খুব ভক্ত একটি মেয়ে আছে, অশোক প্রায়ই বলত।

দেবাদিদেব ওকে ঠাট্টা করে বলত, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে রাজী নই।

দেখাতে ভয় করে।

কেন?

যদি তোমার প্রেমে পড়ে?

প্রেম। প্রেম ছাড়া কোন সহজ সম্পর্কের কথা ভাবতে পারো না? আমার কিন্তু বিরক্ত লাগে। ছেলেতে মেয়েতে অন্য কোন সম্পর্ক হতে পারে না?

হয় না তো!

দেবাদিদেব তখন জানত বিপ্লব এসে গেছে। নতুন সমাজে মেয়েদের নতুন পরিচয় হবে। প্রথমত তারা হবে মানুষ, হিউম্যান বিয়িং। তারপর রমণী। সে সমাজে প্রেমই একমাত্র সম্পর্ক হতে

পারে না। আজ, জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে মনে হয়, ভালবাসাই একটি মেয়ের জীবনে প্রথম ও শেষ কথা হয়ে থেকে যায়।

অশোক ওকে ঈপ্সিতার বাড়ি নিয়ে যায়। দেবাদিদেবের বয়স তখন ত্রিশ। ঈপ্সিতার কুড়ি। ঈপ্সিতা থাকত মাসিদের কাছে। মা ছিলেন না। বাবা সরকারী ডাক্তার। তখন রিটায়ার করেছেন। দেওঘরে ছোট একটি বাড়ি কিনেছেন। মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিজে দেওঘরে থাকবেন। ঈপ্সিতার মাসিরা কনভেণ্টে পড়াতেন, বিয়ে করেননি। ঈপ্সিতাকে যত্নে মানুষ করেছিলেন। ওদের বাড়ি যেতে যেতে অশোক সলজ্জে বলেছিল, ঈপ্সিতাকে ও ছোটবেলা থেকেই চেনে।

দেবাদিদেবের তখন প্রচণ্ড নাম। প্রবল ব্যক্তিত্ব। দারুণ আত্মবিশ্বাস। যেখানে যেত, সেখানেই অন্যদের সব প্রতিরোধ ধূলিসাৎ করে দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের পদতলে সকলকে মুগ্ধ ক্রীতদাস করে ফেলে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসত।

ঈপ্সিতা, ওর বাবা, ওর মাসিমা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মাইকেল থেকে শরৎচন্দ্র, সকলকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল দেবাদিদেব। আজ অবশ্য সেদিনের দেবাদিদেবের সাহিত্যচিন্তায় ও বিশ্বাস করে না। সেদিন করত। ঈপ্সিতা মুগ্ধ বিস্ময়ে ওকে দেখছিল, ওর কথা শুনছিল। জুঁইফুলের মত সাদা, পেলব কমনীয় একটি মেয়ে। পিউরিটান মাসিদের প্রভাব। চুল টেনে বাঁধা, পরণে সাদা শাড়ি, মুখ পাউডার বর্জিত। দীর্ঘ, কোমল আঙুল।

অশোক মুগ্ধ আনন্দে ঈপ্সিতার চোখের আলো দেখছিল। ঈপ্সিতা অশোকের দিকে মাঝে মাঝে চাইছিল। হঠাৎ দেবাদিদেব বুঝেছিল, অশোক ঈপ্সিতাকে নিঃশেষে ভালবাসে।

যাওয়া-আসা করতে করতে বুঝেছিল, অশোক ঈপ্সিতার জীবনে একটা প্রাত্যহিক সত্য। রোদ ও বাতাসের মত ওকে মেনে নিয়েছে ঈপ্সিতা। অশোকের কাছেই শুনেছিল, ভালবাসি, এ কথাটা ওরা

কোনদিন বলেনি। তবু ওরা জানে, একদিন ওরা বিয়ে করবে কিন্তু ঈপ্সিতার বাবা খুব খুশি নন। তিনি মেয়ের জন্যে আরো ভাল ছেলে পেলে খুশি হতেন।

দেবাদিদেবের তখন মনে হয়েছিল, সে তো অনেক বেশি যোগ্য। ঈপ্সিতাকে দেখে ও বুঝেছিল, এ হচ্ছে সেই মেয়ে, যে উজ্জ্বলা বউদির মত নির্ভর করে, নিঃশেষে নির্ভর করে পুরুষের ওপর। তখনই ওর মনে হয়েছিল, ঈপ্সিতা ওর স্ত্রী হলে ভালই হবে।

আজ বোঝে, মনের অতলে কোথাও, তরুণতর অশোকের চোখের আলো নিবিয়ে দেবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষাও হয়েছিল। ঈপ্সিতার ওকে ভাল লাগবে কি না, তাও জানতে চায়নি। ও, দেবাদিদেব বসু যদি কোন মেয়েকে চায়, সে মেয়ে অন্য কিছু চাইতে পারে, অন্য কারুকে, তাও ভাবতে পারত না।

ঈপ্সিতার মনে ও ঝড় তুলে দিয়েছিল, তোমায় ভালবাসি বলে। ঈপ্সিতা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ও ঈপ্সিতার বাবাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল একেবারে। ললিতাকে কিছু বলা দরকার তা ও মনে করেনি। মনে হয়নি যে তা নয়, কিন্তু ঈপ্সিতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ললিতাকে ওর মন বর্জন করতে শুরু করে। তখন দেবাদিদেব বুঝেছিল, ললিতাকে ও আসলে কত কম ভালবেসেছিল। তখনি ও মনকে এই যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিল, এত সহজে যাকে বর্জন করা যায়, তার প্রতি ভালবাসাটা তাহলে সত্যি ভালবাসা নয়। ঈপ্সিতাকে পাবার জন্যে আমার যে প্রবল তৃষ্ণা, তা ললিতাকে পাবার জন্যে অনুভব করিনি। কথাই ছিল, ভালবাসায় ভাটা পড়লে এ ওকে মুক্তি দেবে। অতএব, আমি যখন মুক্তি চাই, ললিতা নিশ্চয়ই মুক্তি দেবে। আমি ললিতার প্রতি কোন অপরাধ করছি না। ললিতাকে ও সেই কথাই বলেছিল।

ললিতা সাদা হয়ে গিয়েছিল। স্বভাববিরোধী ভীরু হেসে বলেছিল, তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ?

ভাবলে আজও ব্যথা লাগে, বেদনা হয়, দুঃখ হয়। ললিতা কিছুতে

বিশ্বাস করোন, দেব ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিচ্ছে। ও আবার এসেছিল, আবার, আবার। বলত, তুমি বল এটা দুঃস্বপ্ন। তুমি বল দেব, দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে দাও। আমি কি করে তোমাকে না দেখে থাকব? এক শহরে, এক সময়ে, কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে?

তার জন্যে ললিতা এমন করে ভেঙে পড়েছে দেখে একদিকে অহংবোধে তৃপ্তির স্বাদ, নিজের ক্ষমতা জানা। আরেক দিকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলা। দেবাদিদেব বলেছিল, কি আশ্চর্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাই বা থাকল, বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে না কেন?

ললিতা শূন্য, অন্ধকার চোখে চেয়েছিল। বলেছিল, অনেক কেঁদেছি, আর কাঁদব না। তুমি এসব কি বলছ, দেব?

ঠিক বলিনি?

ললিতা বিদ্ধ পশুর মত কাতরে বলেছিল, তোমাকে দেখব সকলের মধ্যে, কথা কয়ে চলে যাব?

নয় কেন? সীন করবে? ছিটকে বেরিয়ে যাবে?

তুমি কি মানুষ, দেব? কার সঙ্গে কথা বলছ? তোমাকে দেখব, চলে যাব? আমি যে তোমাকে জীবনের সর্বস্ব করে তুলেছি! তোমাকে দেখলে মনে হবে না, ওই বুকে মাথা রেখে আমি বসে থেকেছি। ওই আঙুল নিয়ে আমার কপালে মুখে বুলিয়েছি, তোমার অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর অবিচারের জন্যে সেই তুমি আমার হলে না, এ কথা ভুলে আমি সহজ হব?

ললিতা, অমন কথা বল না।

ঈপ্সিতা তোমার মনে অনুভূতি জাগায়, তার তোমাকে প্রয়োজন। না দেব, না। তোমাকে ছাড়া তার জীবন চলে যেত, আমার চলবে না। তুমি তা জানতে। জেনে শুনে তুমি আমায় অন্ধকারে ফেলে দিলে।

না-না, তা নয় ললিতা।

ভাবতে খারাপ লাগছে। তোমার যে অহঙ্কার, তাতে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও। আবার তুমি যে ভাল লোক, সহৃদয়, মহান, বিবেচক, হৃদয়বান, সে ইমেজও অটুট রাখতে চাও, তাই না?

আমি খারাপ লোক নই, তুমি তা একদিন বুঝবে।

ললিতা মুখ ঢেকে শুয়েছিল, তারপর উঠে আঁচল গুছিয়ে নেয়। আঙুল মেলে দেখে নিজের হাত। যেন সব ওর অচেনা। তারপর বলে, যাও, ঈপ্সিতাকে বিয়ে করগে। আমি শেষ হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত জীবন তুমি চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছ, সে কথা তোমাকে তাড়না করে ফিরুক, তুমি যেন ভুলতে না পারো। কিন্তু কার কাছে বলছি? হৃদয়বান তুমি। তোমার হৃদয় নাই দেব। তুমি যা করলে, তারপর হৃদয় আছে এ কথা বোলো না। আমি যাচ্ছি। কথা দিয়ে গেলাম, কোথাও আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তুমি নই। তোমার সব সইবে। আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েও তুমি সুখী হতে পারবে। আমি ভীরু, কাপুরুষ আমার সইবে না। নিজের ওপর আমার অত বিশ্বাস নেই।

দেবাদিদেব সেদিনও ললিতাকে বিশ্বাস করেনি।

দেবাদিদেব ঈপ্সিতাকে বিয়ে করেছিল।

ললিতার কথা মুখফিরতি শোনা।

হঠাৎ আড়ালে চলে গিয়েছিল ললিতা। কোন জায়গায় যেত না। যেখানে গেলে দেবাদিদেবের সঙ্গে দেখা হতে পারে সেখানে তো নয়ই। পথে না, ট্রামেও না, কোথাও ওকে বহুদিন দেখেনি দেবাদিদেব।

অন্যেরা দেখেছে। অন্য পথে ললিতা হাঁটছে, পা টেনে-টেনে হাঁটছে আর হাঁটছে। একা বসে থাকছে মিণ্টো পার্কে, ভিক্টোরিয়া স্কোয়্যারে। চিড়িয়াখানায় বসে থাকছে গাছের নিচে, যতক্ষণ না মালী বলে, বন্ধ্ হো গিয়া, উঠিয়ে দিদি।

দেবাদিদেব শুনেছে ওর ব্রেন ফিভার হয়েছিল। বহুদিন ভুগেওছিল। তারপর ও দিল্লী চলে যায় রেডিওতে চাকরি নিয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিলেত। বিলেতে এক মারাঠি ভদ্রলোককে বিয়ে করে। ভদ্রলোককে বিলেতে রেখে চলে আসে ভারতে। ভদ্রলোক ওখানেই মারা যান। ললিতা খুব শান্ত, গম্ভীর, চিরবিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, পাথর-পাথর মুখ। দেখলে চেনা যেত না।

এতকাল বাদে, এবার ডালহৌসি আসার আগে, দেবাদিদেব যখন নিজেকে নিয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ, একদিন নিউ মার্কেটে দেখা হয়। ললিতা হেঁটে শর্টকাট করছিল মার্কেটের ভেতর দিয়ে। ধবধবে সাদা চুল, টেনে বাঁধা, ঋজু ও শীর্ণ শরীর, চোখে মোটা কাচের চশমা, তবু ললিতা।

দেবাদিদেবের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ললিতা। বলেছিল, এত রোগা হয়ে গেছ যে? অসুখ করেছিল?

তুমিও তো বদলে গেছ কত? চুল সব সাদা হয়ে গেছে।

সে তো বিশ বছর আগে।

বিশ বছর!

হ্যাঁ।

দেবাদিদেব মনে মনে হিসাব করেছিল, চল্লিশ না হতেই ললিতার চুল পেকে যায়। হয়তো পঁয়ত্রিশেই···

ভাল আছ? দেবাদিদেব জিজ্ঞেস করেছিল।

না। ললিতা বলেছিল, সোশ্যাল টক নাই বা করলাম। ওতে তো তোমার অস্বস্তি।

তুমি কেমন আছ?

চলছে।

ললিতার ভেতর থেকে অসীম অনুকম্পা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দেবাদিদেব টের পাচ্ছিল।

ললিতা অচেনা, নিচু, ক্লান্ত গলায় বলেছিল, তুমি ভাল নেই

ঈপ্সিতা ভাল নেই, আমি ভাল নেই, বহু বছর ধরে। আমরাই অপচিত হইনি, তুমি হয়েছ দেব। যদিও তুমি তা স্বীকার করবে না কেননা স্বীকার করলে মানতে হয় তুমি হেরে গেছ।

এসব কি বলছ ললিতা?

হেরে যাওনি দেব? কোন হার-না-মানা লোক ওই ট্র্যাশ লিখতে পারে, তুমি যা লেখ?

তুমি পড় আমার লেখা? তাহলে শোনো, সব লেখাই কি ভাল হয়?

পড়ি। মানে, দশ বছর আর পড়ি না। 'নগর নাগরী' পড়ার পর তোমার লেখা পড়াটা বাজে শ্রম বলে মনে হত। দেখলাম, বাইশ বছর আগে যে অবক্ষয়ের শুরু, তা সম্পূর্ণ হয়েছে।

ললিতার গলা অচেনা, তৃতীয় ব্যক্তির সম্পর্কে চতুর্থ ব্যক্তিকে বলে যাচ্ছে।

ওসব কথা থাক।

ললিতা বলল, তবে থাক।

কপাল কুঁচকে ও দেবাদিদেবকে দেখল কিছুক্ষণ। বলল, ভেব না, পুরনো মনের কিছু অবশিষ্ট আছে। পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে দেব। খোঁচালে এককণা আগুনও পাবে না। কিন্তু কি বাজে খরচ বল তো? আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম, তুমি সব সাফল্য নিয়েও মানুষ হিসেবে ব্যর্থ হলে। ঈপ্সিতাও নিশ্চয়ই ব্যর্থ হল। মাঝে মধ্যে ওর কথা শুনেছি। দূর থেকে দেখেছি কখনো-সখনো। কিন্তু কারো চোখে এমন ভূতে পাওয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্ব দেখিনি। তুমি বোধ হয় ওর চোখের দিকে তাকাও না?

ও সব কথা থাক ললিতা।

কেন অমন করেছিলে বল তো? সেটাই জানতে ইচ্ছে করে।

ললিতা। আমি···আমি···

না, না দেব। বল না, তোমার আচরণ যে ভুল তুমি তা

বুঝেছিলে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু ঈপ্সিতা ওম্যানলি ওম্যান, তাই ওকে ছেড়ে দাওনি। ছেলেদের কথাও ভেবেছিলে নিশ্চয়ই। বল না, বুঝেছিলে আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলতাম, বুঝেছিলে যদি কেউ তোমাকে চেয়ে থাকে, সে আমি।

কি বলব বল? তুমিই তো সব বললে।

ললিতা মাথা নাড়ল, কপাল থেকে সাদা চুল সরাল। অচেনা গলায় বলল, কিন্তু এই দেখা হওয়াটার প্রয়োজন ছিল। একদিন ভালবেসে বলেছিলাম, আমার স্মৃতি তোমাকে তাড়না করুক। আজ বলে যাচ্ছি, তোমায় আমি ভালবাসি না, কিন্তু তোমার জন্যে আমি আর কাউকে ভালবাসিনি। অত্যন্ত ভাল একটি লোককে দুঃখ দিয়েছি, নিজেও ব্যর্থ হয়েছি। এ সব তোমারই ঘটানো। যে তোমাকে চেনে না, তুমিই পরোক্ষে তার দুঃখের কারণ হয়েছ। দেব, আজ এই বয়সে, সে কথাগুলো তোমার বাকি জীবনকে মাঝে মধ্যেও বিদ্ধ করুক। তুমি জানো, তুমি অন্যায় করেছিলে। তুমি মুখে যাই বল, আসলে তুমি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, হৃদয়হীন।

ললিতা চলে গেল। দেবাদিদেবকে হৃতসর্বস্ব, হতভাগা করে রেখে গেল। ললিতার চোখ, গলার স্বর, কথা, দেবাদিদেবের ভেতরে ফাটল ধরিয়ে দিয়ে ধ্বস্ নামিয়ে দিয়েছিল। ভালবাসা এমন করে কাউকে নিয়ন্ত্রণ করে? ভালবাসায় ব্যর্থ হলে এমন করে কারো কেন্দ্র টলে যায়? দেবাদিদেবের ভয় হয়েছিল। কি সে? মানুষ নয়, সম্পূর্ণ মানুষ নয়, সে শুধু ধ্বংস করতেই পারে?

আজ পাঠানকোট এক্সপ্রেস যখন শেয়ালদার দিকে ছুটছে, তখন দেবাদিদেবের ললিতার কথাই আগে মনে পড়ল। হ্যাঁ, ঘরে ফেরা মানে যদি হয় সকল অক্ষমতা ও ব্যর্থতাকে মানসিক অক্ষমতা, মানবিক ব্যর্থতা বলে মেনে নিয়ে স্বীকার করা, শুদ্ধ হওয়া, তাহলে ললিতার কথাই তো আগে মনে করতে হবে। ওর জীবনের ধারা

যেন ললিতার সময় থেকেই দ্বিধারায় বয়ে লক্ষচ্যুত হতে থাকে। বলবন্তের সময়ে, পুলকবাবুর সময়ে সে ধারা আরো, আরো স্রোতে বয়। তারপর তা বহুধা হয়ে যায় মোহনার নদীর মত, বহু দ্বীপের জটিল নক্‌শা তৈরি করে, বহু বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। দ্বীপ তো পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্নই হয়। প্রতিটি ধারা একই সাগর অভিলাষী। সে সাগর দেবাদিদেব বসু। সমুদ্র যেমন সকল নদীধারার জল গ্রহণ করে পুষ্ট হয়, দেবাদিদেবের জীবনও তেমনি বহু খাতে বয়ে, বহুভাবে ওর ইমেজকেই পুষ্ট করেছে। কিন্তু তাতে কি লাভ হল ওর? সে জলে তো কারও তৃষ্ণা মেটে না? লবণাক্ত, লবণাক্ত, হিংস্র সে জল।

আগে ললিতা, পরে ঈপ্সিতা। কিন্তু শেষ অবধি চূড়ান্ততম অপরাধ বোধহয় ঈপ্সিতার ওপরেই করে ও। আজ তাই মনে হচ্ছে। তাই শুদ্ধ, মুক্ত হয়ে ঈপ্সিতার কাছে ফেরার, নিজের ঘরে ফেরার এই আকুতি। আর কোন প্রলোভনের কাছে হার মানা নয়, আর কিছু চাইবে না ও। স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। সম্পূর্ণ সততায় লিখতে পারলে লিখবে, নইলে লিখবে না।

ঈপ্সিতাকে ও বিয়ে করেছিল।

ঈপ্সিতা অশোককে বলেছিল, তুমি তো মুহূর্তে এ সমস্যার সমাধান করতে পারো।

না, অশোক পারত না। তখন সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ও দলের কাজ করে। ডাক্তারের সামনে তখন অনেক কাজ। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত বাংলায় ডাক্তারদের কাজ খুব বেশী থাকত।

অশোক অভ্যস্ত, নরম গলায় বলেছিল, এখনি তো সেটা হয় না।

কবে তোমার সময় হবে?

এখনি কি করে বলি বল তো?

কিন্তু সময় আর কোথায়, অশোক ?

এখন তো আমি জেলায় কাজে চলে যাচ্ছি ঈপ্সিতা !

আমি কি করি বল তো ?

কি বলব ? আমার অবস্থা তুমি তো জানো।

অশোক, আমাকে বাদ দিলে তোমার চলে যাবে তো ?

বড় দুঃখে বলেছিল ঈপ্সিতা, কাতর হয়ে। অশোক কি বুঝেছিল, দেবাদিদেব যখন মনস্থ করেছে. ঈপ্সিতাকে ও বিয়ে করবেই ? ও কি বুঝেছিল, দেবাদিদেব ঈপ্সিতাকে ললিতার কথা বলেনি ?

অশোক আস্তে বলেছিল. আমি চালিয়ে নেব।

অশোক কি ভেবেছিল, বিপ্লব আসছে, ও প্রতিশ্রুত কর্মী ও সৈনিক ! ব্যক্তিগত জীবনকে উৎসর্গ করাতে বেদনা আছে, ব্যর্থতা নেই। তাই মনে মনে ও ঈপ্সিতা যাতে বিয়ে করার প্রস্তুতি পায় সে জন্যে ঈপ্সিতাকে বুঝিয়েছিল, সহায়তা করেছিল ?

তাই ও ঈপ্সিতাকে সেই সব কথা বলেছিল ? দেবাদিদেব অনেক ওপরের মানুষ। ও এক প্রজ্জ্বলন্ত প্রতিভা। ও-ই এ দেশের আলেক্সি, তলস্তয় ও শোলোকভ ! আচরণ বা ব্যবহার দেখে ওকে বিচার করা ভুল। ঈপ্সিতা যদি ওকে বিয়ে করে, পরোক্ষে এক মহান আদর্শকে সহায়তা করবে ?

ঈপ্সিতা বলেছিল, ও রাজনীতি বোঝে না।

অশোক বলেছিল, তোমারও সার্থকতা বোধ আসবে।

রামের সেই সেতু দেখে কাঠবেরালের সার্থকতা বোধের মত ?

হয়তো তাই।

অশোক মিথ্যে স্তোক দেয়নি। ঈপ্সিতা সামান্য মানুষ, অশোকও তাই, কিন্তু বিপ্লব যখন ল্যাম্প পোষ্টের আড়ালে পৌঁছে গেছে, তখন অসামান্য ও প্রয়োজনীয় দেবাদিদেবের প্রয়োজনে সামান্যদের আত্মোৎসর্গের দরকার আছে।

দেবাদিদেব ও ঈপ্সিতার বিয়ে হয়। বলবন্তের মৃত্যু পর্যন্ত অশোক

ওদের দুজনেরই বন্ধু ছিল। তারপর ও নিজেই সরে যায়। আজ দেবাদিদেবের মনে হয়, যদিও অনুপস্থিত অশোক, কিন্তু উপস্থিত ঈপ্সিতার কি নিয়ত মনে হয় না, জীবনটাই ব্যর্থ, মানবজীবনের সব অপচয় হয়ে গেছে ?

দেবাদিদেব সম্বন্ধে ঈপ্সিতার মোহ গড়ে তোলা হয়েছিল। সে মোহ ভাঙতে ঈপ্সিতার বেশি সময় লাগেনি।

কেননা দেবাদিদেব, ওম্যানলি ওম্যান ঈপ্সিতার কাছে ললিতার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাধীনচিন্তা, আত্মনির্ভরতা চাইতে শুরু করতে দেরি করেনি। ঈপ্সিতা বলেছিল, দেব, তুমি তো জানতে আমি ললিতা নই।

ললিতার কথা তুমি জানলে কি করে ?

সবাই জানে যে। আগে জানলে……

কি করতে ?

জানি না। হয়তো তোমার কথায় রাজী হতাম না।

আমি তো তোমাকেই চেয়েছিলাম।

চেয়েছিলে! তাই নাকি ? সবসময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, ঘর দেখ না, সংসার দেখ না, ছেলেদের দেখ না, আমায় দেখ না, যখন টাকা পাও, আমাকে ফেলে দাও। আমাকে তোমার কিসের প্রয়োজন ? পিতা হবে, স্বামী হবে, কয়েকটা পরিচয়ের জন্যে, তাই নয় কি ? বাইরে বলে বেড়াও, তোমার বউ আপোলিটিকাল, জিনিয়াসের মর্ম বোঝে না।

ঈপ্সিতা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। তারপর থেকে তিলে তিলে দেবাদিদেব বদলিয়েছে, ধর্ম ও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছে। ঈপ্সিতা একটি কথাও বলেনি। কিন্তু দেবাদিদেব জানে, ঈপ্সিতার অনুসন্ধানী চোখের সামনে ও যখনি দাঁড়িয়েছে, ঈপ্সিতা সব রং ও ডাকের সাজ ভেদ করে নিচে কাদামাটি, বাঁশ ও খড়ের কাঠামোটাই দেখেছে। ঈপ্সিতাকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি।

কিন্তু সব তো আজ জেনেছে দেবাদিদেব। নিজের স্বরূপ জানার বিরুদ্ধে নিজের গড়া যত প্রতিরোধ ছিল, সব ভেঙে দেখেছে নিজেকে। ফিরে গেছে নিজের উৎসে। নিজের রোপিত প্রতিটি পথের কাটা সরিয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে। কিন্তু নিরস্ত হয়নি।

আজ ও জানে, একদিনে কেউ প্রতিশ্রুতি ভাঙে না। অসৎ অবিবেকী হয় না। চরিত্রে ও স্বভাবে সবকিছুর বীজ থাকে। প্রথমে স্বভাব ফুলকে লালন করে, তারপর আগাছাকেও। আগাছা বেড়ে একদিন ফুলগাছ ঢেকে দেয়। একদিন দেবাদিদেব সৎ ছিল তারপর প্রলোভনে, ক্ষমতার লোভে, সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে, একটু একটু করে ঘরের পথ ছেড়ে বাইরের পথে পা দিয়েছে। তারই পরিণতি আজকের দেবাদিদেব বসু।

হ্যাঁ, সব বলবে সে। কোন সম্মান বা পুরস্কার নেবে না। আবার নতুন করে আত্মজীবনী লিখবে। ললিতা, বলবন্ত, ঈপ্সিতা, পুলকবাবু, শঙ্কর দয়াল···সকলের। আরো বহুজনের কথা লিখবে। স্বীকার করবে ও ব্যর্থ, অনুতপ্ত, অপরাধী। ওর সেই নতুন আত্মজীবনী অন্য লেখকদের সতর্ক করবে। সেদিন ও হবে শ্রদ্ধেয়, মান্য। ওকে স্মরণে রাখবে। ঈপ্সিতা সেইজন্যে অপেক্ষা করে আছে।

পরদিন পাঠানকোটের ট্রেন শেয়ালদা পৌঁছল।

সাত

স্টেশনে ওকে খুঁজছে সবাই। দিলীপ চন্দভারকার, মনীষী সেন, অরুণিম দাশ, কেকয় কোহেন, আরো কতজন। সোমেশের হাতে ক্যামেরা। গোপাল পেছন থেকে চেঁচাচ্ছে। ওকে দেখে সবাই হই-হই করে এগিয়ে এল। অনেক পিছনে ঈপ্সিতা। দাঁড়িয়ে। একা, ওর দিকে চেয়ে।

এসে গেছে, এসে গেছে। সবাই চেঁচিয়ে ছুটে এল।

কি হয়েছে, কি ?

তুমি···পেয়েছ। দেখ! গ্রেটেস্ট অনার!

আমি ?

হাঁ তুমি।

আমি।· হেসে উঠল দেবাদিদেব। সবাই জড়িয়ে ধরল ওকে।

গোপাল বলল, বউদি টেলিগ্রাম করেনি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই পেয়েই তো······

কেকয় বলল, খুব ঝড় উঠবে।

দেবাদিদেব বলল, তা উঠবে।

বলতে বলতে ওর ভেতরে কি যেন গজিয়ে উঠতে লাগল। কাঁটার মত তীক্ষ্ণ. উঁচু, কিসের দেওয়াল ? দুঃখ, ভীষণ দুঃখ। কিন্তু দুঃখ হবে কেন ? না-না, আনন্দ। তীব্র অনুভূতির সময়ে আনন্দ ও দুঃখ সমান মনে হয়। কিন্তু কোথায় যেন একটা ছেলে পদ্মার পারের আদিগন্ত মাঠের বুকের সিঁথি ধরে ঘরে ফিরতে চায়। সে দেখে, পথ আটকে গজিয়ে উঠছে অসি ফলকের মত ধারালো পাতার গাছ। বড় সুন্দর তো! এইটে নিয়ে দেবাদিদেব একটা সুন্দর গল্প লিখবে।

চল, আমাদের সঙ্গে চল।

বাড়ি যাব যে।

আরে, আমরাই তোমায় নিয়ে যাব।

ঈপ্সিতা! ঈপ্সিতা, এসো।

আগে ছবি তুলি একটা। বউদি, আসুন। একসঙ্গে ছবি তুলি।

দেবাদিদেব মুখ তুলল। ঈপ্সিতা ওর চোখে চোখ রাখল, পিছন ফিরল, তারপর চলে যেতে থাকল সোজা হেঁটে।

গোপাল বলল, কি হল ? বউদি চলে যাচ্ছে যে!

দেবাদিদেবের চশমার নিচ থেকে একটু জল গড়িয়ে পড়ল। ওর

বন্ধুরা বিভ্রান্ত হয়ে চুপ করে গেল। সোমেশ শাটার টিপল, ফ্ল্যাশ বাল্‌বের আলো। '—' পাবার পর দেবাদিদেবের চোখে আনন্দাশ্রুর রেকর্ড।

দেবাদিদেব অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। ও বুঝল, জীবনের কোন অধ্যায়ই শেষ হল না ওর, হল না ঘরে ফেরা। শুরু হল না কিছু। ও ঘরে ফিরতে চেয়েছিল তা যেমন সত্যি, ফিরতে পারল না, ফিরতে চাইল না, তাও তেমনি সত্যি। আসলে, জীবনে শুরু, বহতা, এবং শেষ একই সঙ্গে চলে। দেবাদিদেব সেই তিন তিনটে স্রোতের মাঝখানে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। জীবন এ রকমই হয়। চিরকাল। পালাবার পথ থাকে না।

শেষ